খাদ্য সমৃদ্ধকরণ সহায়িকা

জুন ২০২৫

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ:

প্রকাশ কাল:

প্রকাশক:

মুদ্রণ:

মুখবন্ধ

খাদ্যে অনুপুষ্টি বা (Micronutrient) এর ঘাটতি উন্নয়নশীল বিশ্বের একটি গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে প্রায় ২ বিলিয়ন মানুষ ভিটামিন ‘এ’ এবং খনিজলবণের ঘাটতিজনিত সমস্যায় ভুগছে। বিশেষ করে ফোলেট, আয়রন, ভিটামিন ‘এ’ এবং জিঙ্ক প্রাক-বিদ্যালয় বয়সী শিশুদের এবং প্রজননক্ষম বয়সী নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অনন্য অবদান রাখে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দীর্ঘদিন ধরে অপুষ্টিজনিত ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ বা Food Fortification চালু আছে। সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন দেশের এবং আর্ন্তজাতিক তথ্য থেকে দেখা গেছে যে, খাদ্য সমৃদ্ধকরণ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলির জনসংখ্যার পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক উন্নয়নে বেশ উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। বিগত তিনদশকে শিশু পুষ্টিহীনতার এক তৃতীয়াংশ হ্রাস করার মাধ্যমে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। এতদ্সত্ত্বেও ভিটামিন ‘এ’ ফলিক এসিড, ক্যালসিয়াম, আয়রন, জিঙ্ক, আয়োডিন প্রভৃতি অনুপুষ্টির (Micronutrient) অভাবজনিত সমস্যা এবং শিশুর খর্বতা, কৃশতা কম জন্ম ওজন ইত্যাদির মতো গুরুতর অনুপুষ্টির অভাবজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে। অনুপুষ্টির ঘাটতি মোকাবেলায় বিশ্বের সফল উদ্যোগসমূহের অনুসরণে বাংলাদেশেও বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম চলমান আছে।

একজন গর্ভবতি নারীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো স্বাভাবিকের চেয়ে অতিরিক্ত খাবার এবং সেই সাথে প্রতিদিন আয়রন, ফলিক এসিড ট্যাবলেট গ্রহণ ও কঠোর পরিশ্রমের কাজ থেকে বিরত থাকা। শিশুকে বুকের দুধ প্রদানকারী নারীকে প্রতিদিন অনুরূপ অতিরিক্ত খাবার খেতে হবে এবং শিশুর জন্মের দুইমাসের মধ্যেই তাকে প্রত্যহ ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ানো শুরু করতে হবে। শিশু জন্মের সাথে সাথে (জন্মের প্রথম ৩০ মিনিটের মধ্যেই) শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো শুরু করতে হবে, ৬ মাস পর্যন্ত শিশুকে শুধুই বুকের দুধ দিতে হবে। ৬ মাসা বয়সের পর থেকে যথাযথ পরিমাণে পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্যের সাথে কমপক্ষে দুইবছর বুকের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যেতে হবে। শিশু অসুস্থ হলে উপযুক্ত যত্ন নিতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শিশু যেন তার দৈনন্দিন খাবারে প্রয়োজন অনুযায়ী অনুপুষ্টি যথা ভিটামিন ‘এ’, আয়রন এবং আয়োডিন জাতীয় খাদ্য উপাদান পায়। প্রত্যেক মায়ের বিশেষ যত্নসহকারে এই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে জানা ও অনুসরন করা উচিৎ, যা শিশুর শারিরীক ও মানসিক বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য একান্ত অপরিহার্য। বৈচিত্র্যপূর্ণ পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য যথা ফল, শাকসবজি, শস্যদানা, ডাল, বাদাম, তৈলবীজ, দুধ, ও দুগ্ধজাতীয় খাদ্য, ডিম, মাংস ও মাছ গ্রহণের পাশাপাশি বহু উপাদান বিশিষ্ট অনুপুষ্টি পাউডার মিশিয়ে পারিবারিক শিশু খাদ্য সমৃদ্ধকরা হলে তা শিশুর পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের অব্যাহত উন্নয়নের সহায়ক হবে।

খাদ্য সমৃদ্ধকরণ যাত্রায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেরও এগিয়ে যাওয়ার জন্য এই সহায়িকা কিছুটা হলেও উপকারে আসবে। অবশ্য এ উদ্দ্যোগের সফলতা নির্ভর করে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সরকারী, বেসরকারি এবং উন্নয়ন সংস্থার সকল অংশীজনদের অঙ্গীকার এবং আন্তরিকতার উপর।

এই খাদ্য সমৃদ্ধকরণ সহায়িকাটি যদি নীতি নির্ধারক, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, পুষ্টিবিদ, মাতৃত্ব সংস্থা, নারী উদ্যোক্তা, পুষ্টি উন্নয়ণ সহযোগী এবং সাধারণ ভোক্তাদের কিছুটা হলেও উপকারে আসে তাহলে আমাদের প্রচেষ্টা এবং শ্রম সার্থক হবে।

....

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
	মুখবন্ধ	
প্রথম অধ্যায়	১.০ খাদ্য, পুষ্টি ও সুষম খাদ্য	
	১.১ খাদ্য	
	১.২ খাদ্য নিরাপত্তা	
	১.৩ খাদ্যের শ্রেণী বিভাগ	
	১.৪ খাদ্যের কাজ	
	১.৫ পুষ্টি	
	১.৬ পুষ্টি নিরাপত্তা	
	১.৭ পুষ্টি উপাদান	
	১.৮ সুষম খাদ্য	
	১.৯ পুষ্টির কাজ	
	১.১০ অপুষ্টি	
	১.১১ অপুষ্টির প্রকারভেদ	
	২.০ পুষ্টি উপাদানের খাদ্য উৎস এবং দেহে কার্যকারিতা	
দ্বিতীয় অধ্যায়	২.১ আদর্শ খাদ্য গ্রহণের নির্দেশাবলী	
	২.২ প্রধান ও সহায়ক পুষ্টি উপাদান সমূহ	
তৃতীয় অধ্যায়	৩.০ খাদ্য সমৃদ্ধকরণ (Food Fortification):	
	৩.১ ভূমিকা	
	৩.২ খাদ্য সমৃদ্ধকরণের পথযাত্রা	
	৩.৩ অনুপুষ্টি ঘাটতি পূরণে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ	
	৩.৪ খাদ্য সমৃদ্ধকরণ পদ্ধতি	
	৩.৫ খাদ্য সমৃদ্ধকরণ প্রকারভেদ	
	৩.৬ খাদ্য সমৃদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার জন্য বিশেষ বিবেচ্য বিষয়সমূহ	
	৩.৭ খাদ্য সমৃদ্ধকরণের জন্য উপযুক্ত খাদ্য নির্বাচন	
	৩.৮ খাদ্য সমৃদ্ধকরণের জন্য যা প্রয়োজন	
	৩.৯ খাদ্য সমৃদ্ধকরণের সীমাবদ্ধতা	
	৩.১০ দেশ ভিত্তিক খাদ্য সমৃদ্ধকরণের বিবরণ	
চতুর্থ অধ্যায়	৪.০ খাদ্য সমৃদ্ধকরণে ব্যবহৃত অনুপুষ্টি উপাদান সমূহ	
	৪.১ আয়োডিন ও আয়োডিন দিয়ে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ	
	৪.১.১ আয়োডিনের খাদ্য উৎস ও গ্রহণের মাত্রা	
	৪.১.২ আয়োডিনের অভাবজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা	
	৪.১.৩ লবণে আয়োডিন পরীক্ষা পদ্ধতি	
	৪.১.৪ আয়োডিন দিয়ে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট	
	৪.২ ভিটামিন 'এ' দিয়ে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ	
	৪.২.১ ভিটামিন 'এ' এর অভাবজনিত সমস্যা	

৪.২.২ ভিটামিন ‘এ’ এর উৎস ও প্রয়োজনীয় মাত্রা
৪.২.৩ বাংলাদেশে ভিটামিন ‘এ’ দিয়ে ভোজ্যতেল সমৃদ্ধকরণ
৪.২.৪ সমৃদ্ধিকৃত ভোজ্যতেলে গুণগত মান বজায় রাখা
৪.২.৫ শিশুদের ভিটামিন ‘এ’ সাপ্লিমেন্টেশন এবং খাবারে ভিটামিন এ সমৃদ্ধ ভোজ্যতেল ব্যবহার
৪.২.৬ ভোজ্যতেলে বাধ্যতামূলকভাবে ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধকরণ আইন
৪.৩ ভিটামিন ‘ডি’ দিয়ে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ
৪.৩.১ ভিটামিন ‘ডি’ এর অভাবের কারণসমূহ
৪.৩.২ ভিটামিন ‘ডি' সমৃদ্ধকরণ: বাংলাদেশের প্রচেষ্টা
পঞ্চম অধ্যায় ৫.০ বিভিন্ন প্রকার খাদ্য সমৃদ্ধকরণ
৫.১ চাল সমৃদ্ধকরণ
৫.১.১ চাল সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম
৫.১.২ পুষ্টি সমৃদ্ধ চালের গ্রহণযোগ্যতা ও পুষ্টি উপাদান
৫.১.৩ পুষ্টি চালের রন্ধন ও সংরক্ষণ পদ্ধতি
৫.২ গমের আটা সমৃদ্ধকরণ
৫.২.১ গমের আটা সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রমের সূচনা ও বিস্তার
৫.২.২ পুষ্টি উপাদান এবং নীতিমালা বাস্তবায়ন
৫.২.৩ গমের আটা সমৃদ্ধকরণের উপকারিতা
৫.২.৪ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

প্রথম অধ্যায়

১.০ খাদ্য, পুষ্টি ও সুষম খাদ্য

১.১ খাদ্য

আমাদের জীবন ধারণের জন্য একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হল খাদ্য। আমরা সুস্থ, সবল, রোগমুক্ত ও কার্যক্ষম থাকার জন্য প্রতিদিন যাহা খাই, যার উৎস, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত পদ্ধতি সমন্ধে আমরা অবগত এবং যাহা সামাজিকভাবে স্বীকৃত-তাহাই খাদ্য। দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও ক্রয়পূরণ, দৈনন্দিন কাজের জন্য শক্তির যোগান এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আমরা খাদ্য খাই। খাদ্য পরিপাকের পর রাসায়নিক ভাবে ভেঙ্গে দেহে শোষিত হওয়ার উপযোগী উপাদানে রূপান্তরিত হয়। বয়স ও শারীরিক অবস্থা ভেদে একই খাবার সবার জন্য প্রযোজ্য এবং উপযোগী নাও হতে পারে। খাদ্য শুধু ক্ষুধা নিবারণ করে না আমাদেরকে মানসিক প্রশান্তিও দেয় এবং সামাজিক বন্ধন ও আত্মীয়তা সুদৃঢ় করে। সুষম খাদ্য মানুষকে দৃষ্টিনন্দন দেখাতে ও সুস্থ্য জীবনযাপন করতে সহায়তা করে।

১.২ খাদ্য নিরাপত্তা

যদি সব মনুষ সু-স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষম জীবন যাপনের জন্য সবসময় নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের সরবরাহ পায় এবং ক্রয় করার ক্ষমতা রাখে তাকে খাদ্য নিরাপত্তা বলে। খাদ্য নিরাপত্তা হলো খাদ্যের যথাযথ সরবরাহ এবং ভোগ করার যোগ্যতা। খাদ্য নিরাপত্তার উপাদান গুলো হলো - প্রয়োজন এবং পরিমান মত খাদ্যের সরবরাহ; বাস্তবিক, আর্থিক ও সামাজিক নিশ্চয়তা; সময় মতো প্রাপ্তির স্থিতিশীলতা; খাবারের গুনগত এবং পুষ্টিগত মান এবং জনগনের খাদ্য ভোগ করার ক্ষমতা।

১.৩ খাদ্যের শেণী বিভাগ

মানুষের চাহিদা অনুযায়ী খাদ্যকে প্রধানত চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়-

১) খাদ্যের উপাদান ভিত্তিক

(ক) শর্করা-শক্তি, সরবরাহকারী (যেমন- চাল, গম, ভূট্টা, মিষ্টি আলু)।

(খ) আমিষ- শরীরর গঠন, ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি, যেমন-মাংস মাছ, ডিম, দুধ, ডাল।

(গ) স্নেহ-শক্তি উৎপাদন, খাদ্যোপাদান শোষন, যেমন-চর্বি, ঘি, মাখন, বাদাম, তৈলবীজ।

২) পুষ্টি চাহিদা ভিত্তিক

(ক) তাপ ও শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য (যেমন- চাল, গম, ভুট্টা, মিষ্টি আলু, তৈলবীজ ও অন্যান্য খাদ্য শস্য এবং এগুলো থেকে তৈরি রুটি, চিনি, তেল, মাখন, ঘি. চর্বি, মধু, গুড় বিস্কুট ইত্যাদি)

(খ) শরীর বৃদ্ধিকারক ও ক্ষয়পূরণকারী খাদ্য (যেমন- মাছ, মাংস, ডিম, কলিজা, সয়াবিন, বিভিন্ন প্রকার ডাল, দুধ, শিমের বিচি ইত্যাদি)

(গ) রোগ প্রতিরোধকারী খাদ্য (যেমন- গাঢ় রঙ্গিন ও সবুজ রঙের সব ধরনের শাক, জাম, পাকা আম, পাকা তাল, পাকা পেঁপে, পাকা কাঁঠাল, আনারস, পেয়ারা, আমলকি, আমড়া, কলা, লেবু, গাজর, মিষ্টি কুমড়া, শিম, দুধ ইত্যাদি)।

৩) খাদ্যের গ্রুপ ভিত্তিক

(ক) ফলমূল ও শাক-সব্জি- ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ, খনিজ পদার্থ ও খাদ্যআঁশ সরবরাহ করে।

(খ) শস্যদানা-শক্তি সরবরাহ করে।

(গ) দুগ্ধজাত খাদ্য- খনিজ ও আমিষ সরবরাহ করে।

(ঘ) তৈল ও স্নেহ জাতীয় - ফ্যাটি এসিড ও ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ সরবরাহ করে।

(ঙ) মাছ, মাংস, ডিম ও মুরগী - আমিষ সরবরাহ করে।

৪) বিবিধ

(ক) উৎপত্তি - প্রাণীজাত ও উদ্ভিদজাত।

(খ) পুষ্ঠি উপাদান - উচ্চ আমিষ, নিম্ন-স্নেহ।

(গ) প্রক্রিয়াজাত মাত্রা - প্রক্রিয়াজাতবিহীন, টাটকা/তাজা, নূন্যতম প্রক্রিয়াজাত, প্রক্রিয়াজাত ও আল্ট্রা প্রক্রিয়াজাত ।

(ঘ) উৎপাদিত খাবার - জ্যাম, জেলী, সসেজ।

(ঙ) ফর্মূলেটেড খাবার - কেক, বিস্কুট, পাউরুটি, আইসক্রিম।

(চ) কৃত্রিম খাবার - খাদ্যপ্রাণ, ফ্রুট ফ্লেভারড পানীয়, এনজাইম, ফ্লেভারড পানীয়, এনার্জি পানীয়।

(ছ) ফাংকশনাল খাবার - বোরহানী, দধি, চিয়াসিড, ইসবগুল, সবুজ চা, সয়াদুধ, টফু।

(জ) মেডিক্যাল খাবার - স্যালাইন, ভিটামিন টনিক।

(ঝ) ভেষজ খাদ্য - আমলকি, বহেড়া, হরতকি, পুদিনা পাতা, আদা, রসুন।

১.৪ খাদ্যের কাজ

১) শারীরিক (শরীরবৃত্তিয়) কার্যাবলী

(ক) দেহে শক্তি যোগায়;

(খ) দেহের মূল কাঠামো গঠন করে;

(গ) দেহের বৃদ্ধি সাধন ও ক্ষয় পূরন করে;

(ঘ) বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী ও নিয়ন্ত্রণ করে; এবং

(ঙ) বিপাক ও স্নায়ুর কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে।

২) মনস্তাত্বিক কার্যাবলী

(ক) স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ দেয়;

(খ) আবেগগত নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে।

৩) সমাজিক কার্যাবলী

(ক) আনন্দ অনুষ্ঠান সফল করে;

(খ) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধারণ করে।

১.৫ পুষ্টি

শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া যার দ্বারা মানব দেহে গৃহীত খাদ্য ও পানীয় পরিপাক, বিপাক ও পরিশোষণ হয়ে দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয় পূরণ, কাজ করার জন্য শক্তি উৎপাদন এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে তাকে পুষ্টি বলে। এ প্রক্রিয়ায় খাদ্য থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান দেহের বিভিন্ন অংশে শোষিত হয় এবং সুস্থ্যজীবন ধারণ ও সার্বিক স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রিত হয়।

১.৬ পুষ্টি নিরাপত্তা

একজন নারী/পুরুষের যখন প্রয়োজনীয় খাবারের সংস্থান থাকে এবং এই খাবার গ্রহণ, জৈবিক পরিপাক ও শোষনের দ্বারা তার রোগ প্রতিরোধ, স্বাভাবিক বৃদ্ধি, গর্ভধারণ, শিশুকে দুগ্ধ প্রদান ও দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন যথাযথভাবে করতে পারে, তাকে পুষ্টি নিরাপত্তা বলে। পুষ্টি নিরাপত্তাহীনতার পরিনতি হলো- ক্ষুধা এবং অসুস্থতা; আর্থ সামাজিক এবং শারীরিক কষ্ট; খাদ্য অধিগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ বিকৃতি।

১.৭ পুষ্টি উপাদান

পুষ্টি উপাদান গুলো হলো শর্করা বা শ্বেতসার, আমিষ ও স্নেহ বা তেল-চর্বি, ভিটামিন বা খাদ্যপ্রান, খনিজ লবণ, খাদ্যআঁশ এবং পানি এগুলোকে মূলতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১) প্রধান পুষ্টি উপাদান

যেসব উপাদান দেহে শক্তি উৎপন্ন করে, ক্ষয় পূরণ ও শারীরিক বৃদ্ধি সাধন করে তাকে প্রধান পুষ্টি উপাদান বলে, যেমন- শর্করা বা শ্বেতসার, আমিষ ও স্নেহ বা তেল-চর্বি ।

চিত্র-১: প্রধান পুষ্টি উপাদান

২) সহায়ক পুষ্টি উপাদান

খাদ্যের যেসব পুষ্টি উপাদান দেহের পরিপাক প্রক্রিয়া, শারীরিক বৃদ্ধি, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সুস্থতা রক্ষায় কাজ করে সেগুলোকে সহায়ক পুষ্টি উপাদান বলে, যেমন- ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ, খনিজ লবণ, খাদ্যআঁশ এবং পানি। এদের মধ্যে খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ লবণকে একসাথে অনুপুষ্টি উপাদান বলা হয়। এ উপাদানগুলো অল্প পরিমানে প্রয়োজন হলেও দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গ সক্রীয় রাখার জন্য এদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্র-২: সহায়ক পুষ্টি উপাদান

১.৮ সুষম খাদ্য

যে খাদ্যে সকল প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান সঠিক পরিমাণ ও অনুপাতে বিদ্যমান থাকে এবং সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যাবতীয় পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে তাকে সুষম খাদ্য বলে। এটি আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং রোগজীবাণুর আক্রমণ প্রতিহত করে। সুষম খাদ্যে মূলত বয়সভেদে প্রতিদিনের শারীরিক চাহিদা অনুযায়ী বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য উপাদান পরিমানমত বিদ্যমান থাকে।

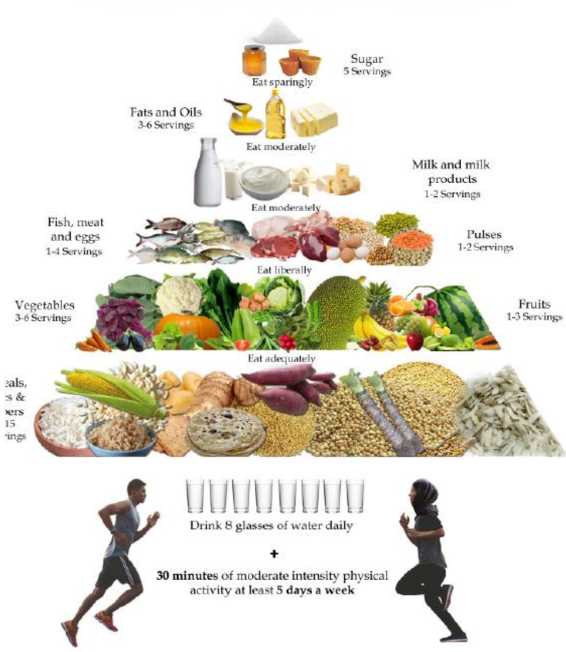

চিত্র -৩: বাংলাদেশী জনগণের জন্য খাদ্য নির্দেশনা পিরামিড

(উৎস - জাতীয় খাদ্যগ্রহণ নির্দেশিকা-২০২০, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার)

১.৯ পুষ্টির কাজ

পুষ্টি আমাদের শরীরকে প্রয়োজনীয় জ্বালানীর যোগান দেয়। দৈনন্দিন আমরা যে সব খাবার খাই তা থেকে প্রাপ্ত পুষ্টি আমাদের মস্তিষ্ক; পেশী; হাড়; স্নায়ু; ত্বক; রক্ত সঞ্চালন, শ্বসন, বিপাক, পরিপাক, রোগ প্রতিরোধ প্রক্রিয়া ইত্যাদি জোরদার করতে ও যথাযথভাবে কার্যকারিতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। সঠিক এবং উন্নত মানের পুষ্টি আমাদের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে এবং হৃদরোগ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, অস্টিওপোরোসিস ইত্যাদিসহ আরো অনেক রোগ থেকে আমাদেরকে নিরাপদ রাখে। বিশেষ করে শিশু, কিশোর-কিশোরী ও গর্ভবতি নারীদের জন্য যথাযথ পুষ্টি অপরিহার্য।

১.১০ অপুষ্টি

সাধারণভাবে অপুষ্টি বলতে বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি উপাদানের ঘাটতিকেই বোঝানো হয়। প্রয়োজনের তুলনায় একজন মানুষ অপর্যাপ্ত বা অতিরিক্ত অথবা ভুলপ্রকারে খাদ্য গ্রহণের ফলে তার দেহে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় সেটাই অপুষ্টি হিসেবে অভিহিত। পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্যের অভাবে সাধারণত বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে অপুষ্টি দেখা দেয়। অপুষ্টিজনিত কারণে দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়,

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং ভুক্তভোগী অতি সহজেই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। জনসংখ্যাধিক্যের ফলে উদ্ভুত খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার অভাব, অপরিকল্পিত নগরায়ন, বিশ্বায়ন ও সংঘর্ষ ইত্যাদি অপুষ্টির অন্যতম কারন। 'ইউনিসেফ' কর্তৃক প্রণীত অপুষ্টি ও এর প্রভাব সম্পর্কিত ধারণাগত কাঠামো ৪নং চিত্রে প্রদর্শিত হলো।

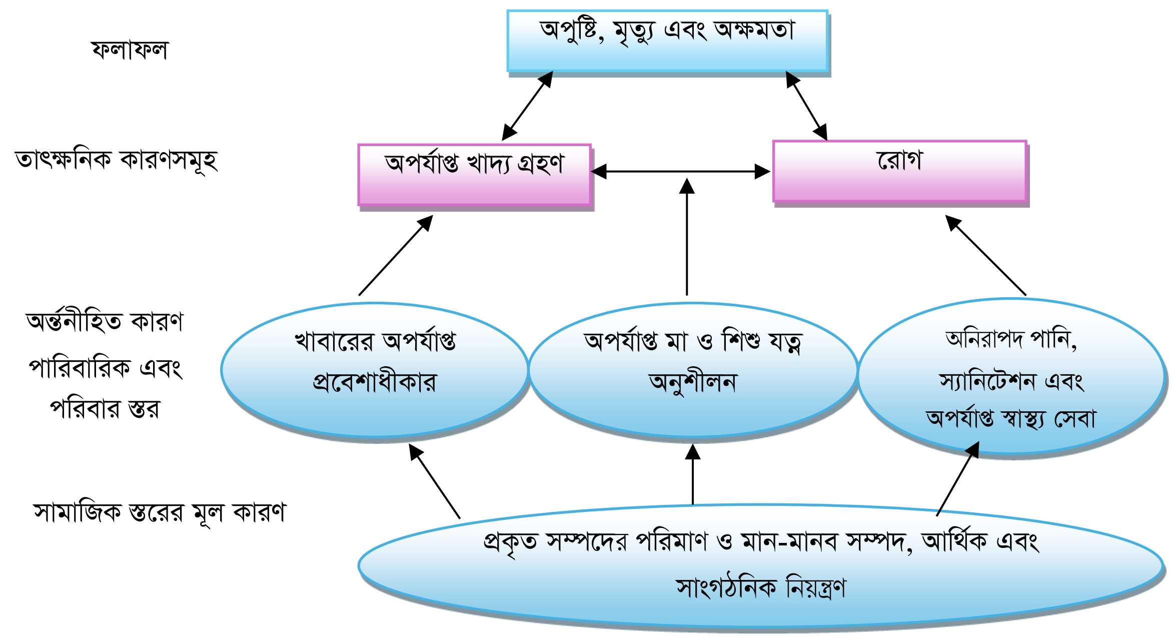

চিত্র-৪: অপুষ্টির কারণ বিশ্লেষণ এবং ধারণাগত কাঠামো (ইউনিসেফ-১৯৯১)

১.১১ অপুষ্টির প্রকারভেদ

অপুষ্টিকে প্রধানত তিন ভাগ ভাগ করা যায়

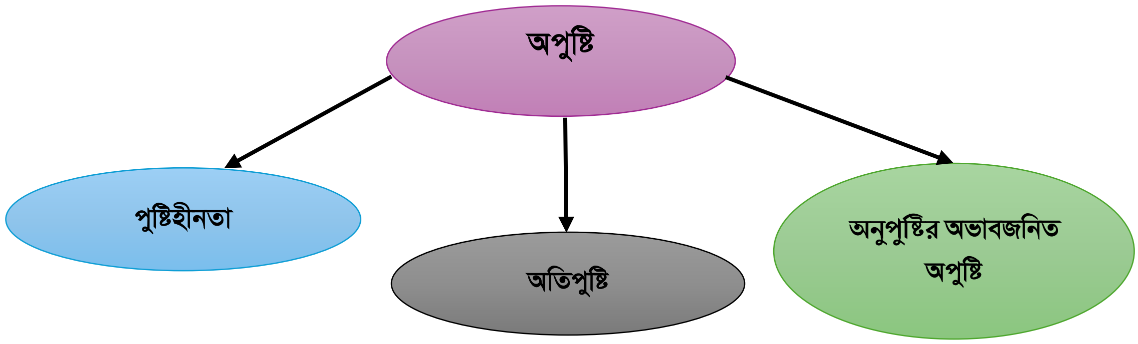

চিত্র-৫: অপুষ্টি প্রকারভেদ

১) পুষ্টিহীনতা

- খর্বাকৃতি (Stunting): বয়স অনুপাতে উচ্চতা কম থাকলে তাকে খর্বাকৃত বলা হয়। দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টির কারণে শিশুদের স্বাভাবিক উচ্চতা তাদের বয়সের তুলনায় কম হতে পারে, যাকে বামনত্ব বা খর্বতা বলা হয়। শিশুদেরকে দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টির হাত থেকে রক্ষা করতে পারলে খর্বাকৃতি প্রতিরোধ করা সম্ভব।

- কৃশকায়তা (Wasting)ঃ উচ্চতার তুলনায় ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম হলে তাকে কৃশকায়তা বলে। শিশুদের তীব্র অপুষ্টি হলে শরীরে চর্বি ও পেশী ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং হ্রাস পায়, ফলে দেহ কৃশকায়তা হয়।
- কম ওজন (Underweight)ঃ বয়সের তুলনায় ওজন কম হলে তাকে কম ওজন হিসেবে ধরা হয়। কম ওজনের শিশু ও বয়স্কদেও বডি মাস ইনডেক্স (বিএমআই) ১৮.৫ এর নিচে হয়। কম ওজনের কারণে খর্বাকৃতি অথবা কৃশকায়তা দুটোই হতে পারে।

২) সহায়ক পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত অপুষ্টি

- এটি সাধারণত শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন, খনিজ লবণ এবং খাদ্যআঁশের অভাবে হয়। এর ফলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং রক্তশূণ্যতা, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশজনিত ঘাটতি, রাতকানা রোগ হয়।

৩) অতিপুষ্টি

- ওজনাধিক্য **(Overweight)** ও স্থূলতা **(Obesity)**: প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাদ্য গ্রহণ ও অলস জীবনযাপান করলে শরীরে অতিরিক্ত ক্যালোরি চর্বি আকারে জমা হয় যা ধীরে ধীরে ওজনাধিক্য ও স্থূলতা সৃষ্টি করে। এই অবস্থা হৃদরোগ, ডায়াবেটিস এবং ক্যান্সারের মতো বিভিন্ন ধরণের মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ায়।
- অসংক্রামক রোগের প্রকোপ বৃদ্ধিঃ অতিপুষ্টির কারণে সৃষ্ট ওজনাধিক্য ও স্থূলতা বর্তমানে একটি বৈশ্বিক স্বাস্থ্য উদ্বেগের কারণ, যা হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, কিছু ধরণের ক্যান্সার এবং অস্টিওআর্থ্রাইটিসের মতো অসংক্রামক রোগের প্রকোপ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করছে। অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং শারীরিক নির্লিপ্ততা এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.০ পুষ্টি উপাদানের খাদ্য উৎস এবং দেহে কার্যকারিতা

২.১ আদর্শ খাদ্য গ্রহণের নির্দেশাবলী

বাংলাদেশের জনগণের সু-স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা ২০২০ - এ যে দশটি নির্দেশনাবলী উল্লেখ করা হয়েছে তা নিম্নে প্রদান করা হলো:

১) প্রতিবেলায় সুষম ও বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য গ্রহণ করুন;

২) পরিমিত পরিমাণে তেল ও চর্বিজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করুন;

৩) প্রতিদিন সীমিত পরিমাণে আয়োডিযুক্ত লবণ গ্রহণ করুন;

৪) মিষ্টি জাতীয় খাদ্য সীমিত পরিমাণে গ্রহণ করুন;

৫) প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ পানি ও পানীয় পান করুন;

৬) নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ করুন;

৭) সুষম খাদ্য গ্রহণের পাশাপাশি নিয়মিত শারীরিক প্রিশ্রমের মাধ্যমে আদর্শ ওজন বজায় রাখুন;

৮) সঠিক পদ্ধতিতে রান্না, সঠিক খাদ্যভ্যাস এবং সুস্থ জীবনযাপনে নিজেকে অভ্যস্ত করুন;

৯) গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে চাহিদা অনুযায়ী বাড়তি খাদ্য গ্রহণ করুন; এবং

১০) শিশুকে ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ দিন এবং ৬ মাস পর বাড়তি খাদ্য প্রদান করুন।

২.২ প্রদান ও সহায়ক পুষ্টি উপাদান সমূহ

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রধান ও সাহায়ক পুষ্টি উপাদানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্রতিটি শ্রেণীর খাদ্য আমাদের শরীরের বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি উপাদানের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রতিদিন বৈচিত্র্যপূর্ণ সুষম খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে আমরা সহজেই এই পুষ্টি উপাদানগুলো পেতে পারি। বিভিন্ন খাদ্যশ্রেণির খাদ্য উৎস, দেহে এসবের কার্যকারিতা এবং অভাবজনিত রোগবালাই নিম্নের ১নং এবং ২নং টেবিলে উল্লেখ করা হলো:

টেবিল ১: প্রধান পুষ্টি উপাদানের খাদ্য উৎস, কার্যকারিতা এবং সংশ্লিষ্ট রোগবালাই

প্রধান পুষ্টি উপাদান	খাদ্য উৎস	কার্যকারিতা	সংশ্লিষ্ট রোগবালাই
শর্করা	**স্টার্চ** ভাত, আলু, মিষ্টি আলু, গম, চিনি, গুড়, পাকা ফল, মধু, মিষ্টি, মিষ্টি পানীয়।	▪ শক্তি সরবরাহ করে ও রক্তে চিনি নিয়ন্ত্রণ করে; ▪ শক্তি উৎপাদনের জন্য আমিষের বিকল্প; ▪ ফ্যাটি এসিডের বিপাক; ▪ খাদ্যআঁশের উৎস; ▪ স্বাদ নিয়ন্ত্রণ।	▪ শর্করার **অভাব** হলে দেহে শক্তির ঘাটতি, দুর্বলতা, ক্লান্তি ও ওজন কমে যায়। ▪ শর্করার **আধিক্য** হলে স্থূলতা, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ও দাঁতের ক্ষয়সহ নানা রোগ দেখা দেয়।

	ফাইবার পাতা জাতীয় শাক-সবজি, খোসাসহ ফল, ওট্‌স, পূর্ণগম, খোসাসহ আপেল।	▪ কোষ্ট-কাঠিন্য দূর করে; ▪ পরিপাক বিলম্বিত করে; ▪ ক্ষুদ্রান্ত্রের ব্যাকটেরিয়ার খাবার সরবরাহ করে; ▪ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে; ▪ শক্তি সরবরাহ করে।	▪ রক্তে চিনি নিয়ন্ত্রণ ব্যহত; ▪ অনিয়ন্ত্রিত কোলেস্টেরল বৃদ্ধি; ▪ কোষ্ঠকাঠিন্য ।
আমিষ	**প্রাণী উৎস** মিঠা পানি ও লোনা পানির মাছ, গরুর মাংস, খাসীর মাংস, মুরগী, ডিম **উদ্ভিদ উৎস** ডাল, বাদাম, বীজ, সয়াবিন ইত্যাদি।	▪ মাংসপেশী তৈরী করে; ▪ দৈনন্দিন আমিষের চাহিদা পূরণ; ▪ এনজাইম তৈরীর জন্য এ্যামাইনু এসিড সরবরাহ; ▪ গর্ভধারণকালী সন্তাানের গঠন প্রক্রিয়ার সুসম্পাদন; ▪ অত্যাবশ্যক এমাইনুএসিড সরবরাহ; ▪ রক্তের পিএইচ নিয়ন্ত্রণ	▪ আমিষের অভাবজনিত কারণে সৃষ্ট রোগগুলির মধ্যে অন্যতম হলো শিশুদের মধ্যে **কোয়াশিওরকর** ও **ম্যারাসমাস।** এই রোগগুলোতে পেশীর ক্ষয়, শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে জল জমা হওয়ার মতো লক্ষণ দেখা যায়। ▪ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, হজমের সমস্যা, প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যা, বিষন্নতা, মানসিক সমস্যা, শিশুদের ধীর বৃদ্ধি ইত্যাদি।
তৈল ও চর্বি	সরিষার তৈল, সয়াবিন তৈল, তিলের তৈল, বাদাম তৈল, অলিভ ওয়েল, ঘি, মাখন, প্রাণী চর্বি ইত্যাদি	▪ এই খাদ্যোপাদান শক্তির উচ্চতর উৎস, যেমন- প্রতি ১ মিলি থেকে ৯ কি. ক্যাল শক্তি পাওয়া যায়; ▪ ভিটামিন এ, ডি, ই এবং কে শোষণ করে; ▪ অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড সরবরাহ করে; ▪ খাদ্যের আয়তন কমায়; ▪ খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধি করে; ▪ ল্যাকটোস শোষণে সহায়ক; ▪ স্নায়বিক প্রক্রিয়ার সহায়ক; ▪ এডিপোজ টিস্যু হিসেবে দেহে জমা হয় যাহা ঠাণ্ডা লাগা, এবং আঘাত প্রতিরোধ সহায়ক। ▪ এগুলো শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুরক্ষা ও কোষগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।	▪ অতিরিক্ত তেল ও চর্বি জাতীয় খাবার রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল বৃদ্ধি করে, যা হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ায়। ▪ এছাড়া, এ ধরনের খাবার স্থূলতা, ডায়াবেটিস, ফ্যাটি লিভার এবং বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারের কারণ হতে পারে। ▪ তেল ও চর্বির অভাবে চর্মরোগ ও ত্বকের ক্ষতি হয়

টেবিল ২: সহায়ক পুষ্টি উপাদানের খাদ্য উৎস, কার্যকারিতা এবং সংশ্লিষ্ট রোগবালাই

সহায়ক পুষ্টি উপাদান	খাদ্য উৎস	কার্যকারিতা	সংশ্লিষ্ট রোগবালাই
ভিটামিন-এ	কলিজা, ছোটমাছ, মাথাসহ (মলা, ঢেলা), মাখন, ফলমূল, পাকা পেঁপে, আম, কাঁঠাল ও আনারস ইত্যাদি, রঙ্গীন সবজি	▪ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ▪ দৃষ্টি শক্তি ভালো রাখে ও উন্নয়ন ঘটায়	▪ রাতকানা ▪ জেরোফথালমিয়া
ভিটামিন-সি	সবুজ পেপে, আমলা, আপেল, কমলা, আঙ্গুর, টমেটো	▪ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ▪ লৌহ শোষণে সাহায্য করে	▪ স্কার্ভি ▪ রক্তশূন্যতা ▪ রক্তপাত নিয়ন্ত্রণ হ্রাস ▪ মাড়িফোলা
ক্যালসিয়াম	দুধ, পনির, দুগ্ধজাত খাবার, পাতাজাতীয় সবজি	ক্যালসিয়াম হাড় ও দাঁত মজবুত করে এবং স্নায়ু ও পেশীর স্বাভাবিক কার্যক্রম বজায় রাখে	▪ ক্যালসিয়ামের অভাবে হাড় দুর্বল হয়ে অস্টিওম্যালেশিয়া, অস্টিওপরোসিস ও শিশুদের রিকেটস হতে পারে। ▪ ক্যালসিয়ামের আধিক্যে কিডনিতে পাথর, কোষ্ঠকাঠিন্য ও হৃৎস্পন্দনের সমস্যা দেখা দেয়।
লৌহ	কলিজা, লাল মাংস, বাদাম, ডিম, সবুজ শাক-সবজি	▪ রক্তের হিমোগ্লোবিন উৎপাদন ▪ হৃদপিণ্ড থেকে টিস্যুতে রক্ত পরিবহনের জন্য কিছু হরমোন তৈরী	▪ রক্তশূন্যতা ▪ দূর্বলতা ▪ হাত পা ঠাণ্ড প্রতিরোধ ▪ ডেঙ্গু রোগ সংক্রমণ
জিঙ্ক	মাংস, দুগ্ধজাত ও সামুদ্রিক খাবার, পূর্ণ শস্য দানা, শীম	▪ রোগ প্রতিরোধ ▪ ক্ষত নিরাময় ▪ ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণ ▪ এনজাইমিক বিক্রিয়া ▪ আমিষ সংশ্লেষ	▪ চুল পড়া ▪ ডায়রিয়া ▪ ক্ষুধা হ্রাস ▪ পুরুষত্বহীনতা
ফলিক এসিড	শস্যদানা, সবুজ সবজি, ডিম, কলিজা	▪ মাতৃগর্ভকালীন শিশুর নিউরাল টিউব ত্রুটি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ▪ ডিএনএ এবং আরএনএ উৎপাদন	মাতৃগভকালীন শিশুর মস্তিষ্ক এবং মেরুদন্ডের গঠণজনিত ত্রুটি
থায়ামিন (বি$_1$)	গোটা শস্য, মাংস, কলিজা, মাছ, ডিম, বাদাম, বীজ, ডাল জাতীয় খাবার, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার, ফলমূল, ইস্ট ইত্যাদি	▪ শর্করা থেকে শক্তি উৎপাদন ▪ স্নায়ুতন্ত্রের সঠিক কার্যকারিতা ▪ খাদ্যকে শক্তিতে রূপান্তর ▪ পেশী ও হৃদপিণ্ডের কার্যকারিতা বজায় রাখা।	▪ বেরিবেরি ▪ রক্তশূন্যতা ▪ বহুমূত্র ▪ কানে কম শুনা

রিবোফ্ল্যাভিন (বি২)	দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার (দই, পনির)), ডিম (বিশেষ করে ডিমের কুসুম), মাংস এবং কলিজা; সবুজ শাকসবজি, বাদাম ও বীজ, গোটাশস্য এবং শস্যজাত পণ্য, মাশরুম ইত্যাদি	▪ খাদ্যকে শক্তিতে রূপান্তর ▪ কোষের বৃদ্ধি ও কার্যকারিতা বজায় রাখা। ▪ লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন ▪ ত্বক ও চোখের স্বাস্থ্য রক্ষা ▪ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসাবে কাজ করে শরীরকে ফ্রি র‍্যাডিকেলের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা।	▪ মুখে ঘা ▪ ঠোঁট ফোলা ▪ চর্মরোগ ▪ চোখের সমস্যা ▪ চুল পড়ে যাওয়া
নায়াসিন (বি৩)	মাংস ও পোল্ট্রি (মুরগির মাংস- বিশেষ করে মুরগির বুকের মাংস, গরুর মাংস, কলিজা), মাছ (টুনাসহ অন্যান্য সামুদ্রিক মাছ), বাদাম ও বীজ (চিনাবাদাম, বিভিন্ন প্রকার বাদাম, সূর্যমুখী বীজ, শণ বীজ/ফ্ল্যাক্স সিড), শস্য (বাদামী চাল বা ব্রাউন রাইস, ভুট্টা, গোটা শস্য), সবুজ শাকসবজি, মাশরুম, বিভিন্ন প্রকারের ডাল, দুগ্ধজাত পণ্য, ডিম, ইস্ট ইত্যাদি	▪ দেহে নায়াসিন খাদ্যকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে। ▪ স্নায়ুতন্ত্র ও পাচনতন্ত্রের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। ▪ ডিএনএ মেরামত করে এবং ▪ ত্বককে সুস্থ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।	▪ ডারমার্টাইটিস ▪ ডায়রিয়া ▪ ডিমেনসিয়া ▪ পেলার্গরা
পাউরিডক্সিন (বি৬)	মাংস, মাছ, গোটা শস্য, বাদাম এবং বীজ, ডাল জাতীয় খাবার, সবজি	▪ আমিষ, শর্করা ও চর্বি বিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ▪ শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করা। ▪ স্নায়ুতন্ত্রের সঠিক কার্যকারিতা বজায় রাখা। ▪ হিমোগ্লোবিন তৈরি করা এবং ▪ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	▪ পেলার্গরা ▪ রক্ত শুন্যতা ▪ চর্ম রোগ ▪ মুখে ও জিহ্বায় ঘা ▪ মানসিক সমস্যা
সায়ানোকোবালামাইন (বি১২)	মাছ, মাংস এবং হাঁস-মুরগি, ডিম, দুধ এবং দুধজাত খাবার	▪ লোহিত রক্তকণিকা তৈরি করা ▪ স্নায়ুতন্ত্রের স্বাস্থ্য বজায় রাখা ▪ ডিএনএ সংশ্লেষণ ও শক্তি উৎপাদনে ভূমিকা পালন।	▪ রক্ত শূন্যতা ▪ পেশী দুর্বলতা ▪ অসাড়তা ▪ উদ্বেগ/দুশ্চিন্তা ▪ বিভ্রান্তি ▪ ডিমেনসিয়া

তৃতীয় অধ্যায়

৩.০ খাদ্য সমৃদ্ধকরণ (Food Fortification)ঃ

৩.১ ভূমিকা

খাদ্য সমৃদ্ধকরণ প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের ভোজ্য উপাদানের পুষ্টির মান উন্নত করার জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বা উৎপাদনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে মূল খাদ্যের সাথে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ ও অনুপাতে ভিটামিন ও খনিজ লবণ মিশ্রিত করা হয়। এক্ষেত্রে দেশ বা অঞ্চলভেদে বহুল ব্যবহৃত ভোজ্য উপকরণ প্রয়োজনীয় অনুপুষ্টি দিয়ে সমৃদ্ধকরণ করা হয় এবং জনগণের পুষ্টিমান উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়। স্বাস্থ্য খাতের বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, টিকাদান, পোলিও, যক্ষা, জলবসন্ত হ্রাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাপক সফলতার মুখ দেখলেও অপুষ্টি এখনো এ দেশে একটি দীর্ঘ মেয়াদী এবং বহুমাত্রিক সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিদ্যামান। বাংলাদেশের এ অপুষ্টি সমস্যা শুধুমাত্র খাদ্য ঘাটতিজনিত নয়, খাদ্যে অনুপুষ্টি উপাদানের ঘাটতি এই নীরব সর্বনাশের এক বড় কারণ। এ অনুপুষ্টি উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে ভিটামিন এ, আয়োডিন, আয়রন, ফলিক এসিড, জিঙ্ক ও বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন 'বি' ।

ভিটামিন এবং খনিজ লবণ মানব দেহে খুব সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন হলেও এর অভাবে দৈহিক ও মানসিক বিকাশে যে অপূর্ণতার সূচনা হয়, সামাজিক জীবনে এবং জনস্বাস্থ্যে এর প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক, দীর্ঘমেয়াদী ও ভয়াবহ। অনুপুষ্টির ঘাটতি একটি প্রজন্মের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে, যেমন মজুরি ও উৎপাদনশীলতা হ্রাস এবং স্বাস্থ্যসেবায় ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি।[1] মানব জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট ক্রমবর্ধমান ঝুঁকিপূর্ণ প্রভাব প্রতিরোধ করার জন্য অনুপুষ্টির ঘাটতি নিরসনে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বব্যাপী, অণুপুষ্টি ঘাটতির বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপাদানগুলো হলো- ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি, আয়োডিন, আয়রন, ফলিক অ্যাসিড ও জিঙ্ক।

এ সব ভিটামিন ও খনিজ উপাদানসমূহের অভাবে মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি, মানসিক বিকাশ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। এর ফলে জনস্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নের উপর সুদূরপ্রসারী ও গভীর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এই সমস্যার একটি কার্যকর সমাধান হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি হলো খাদ্য সমৃদ্ধকরণ (Food Fortification)। সেই সাথে পুষ্টি উন্নয়নে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ একটি স্বীকৃত দীর্ঘমেয়াদী কৃষিভিত্তিক বিনিয়োগ। খাদ্য সমৃদ্ধকরণ বলতে বোঝায়, কোনও খাদ্য পণ্যের সঙ্গে এক বা একাধিক অনুপুষ্টি উপাদান নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশিয়ে খাদ্যটির পুষ্টিমান বৃদ্ধি করা। এটি এমন একটি প্রযুক্তিনির্ভর কৌশল, যা খরচে তুলনামূলক সাশ্রয়ী, প্রয়োগে সহজ, এবং বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে খাদ্যাভ্যাসগত দৃশ্যমান কোন পরিবর্তন ছাড়াই একযোগে উপকৃত করার সক্ষমতা রাখে। বিশ্বব্যাপি পুষ্টি উপাদানের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর চারটি কৌশলের মধ্যে দ্বিতীয় কৌশল হলো খাদ্য সমৃদ্ধকরন। বাংলাদেশে অপুষ্টি নিরসনের জন্য সাম্প্রতিক কালে গৃহীত সাধারণ উদ্যোগগুলো হলো- লবণ (সার্বিক), চাউল (আংশিক) এবং ভোজ্য তেল (আবশ্যিক) সমৃদ্ধকরণ।

অন্যদিকে LSFF (Large-Scale Food Fortification) কর্মসূচি খাদ্য ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। জনগোষ্ঠি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ, অবকাঠামো এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিয়ে গঠিত এই কর্মসূচীটি, খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ, বিপণন, বিক্রয়, খাবার জন্য প্রস্তুতি এবং সর্বোপরি খাদ্য গ্রহণ পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ের সাথে সম্পর্কিত। এই কর্মসূচির মূল

[1] World Health Organization (WHO) and Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nation, Guidelines on Food Fortification with micronutrients Archived 26 December 2016 at the Wayback Machine 2006.

লক্ষ্য হলো- ভোজ্যতেল, লবণ, চাল ও আটার মতো নিত্য ব্যবহৃত খাদ্য পণ্যে ভিটামিন এ, আয়োডিন, আয়রন, জিঙ্ক ও ফলিক অ্যাসিড সংযোজন করা। এভাবে, পুষ্টি বিষয়ে আলাদাভাবে কোন সচেতনতা তৈরি বা জনগণের খাদ্যাভ্যাসগত কোন দৃশ্যমান পরিবর্তন ছাড়াই, দেশের একটি বিশাল জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়। খাদ্য ব্যবস্থার সাথে জড়িত বিভিন্ন অংশীজন (Stakeholders) LSFF কর্মসূচির বিভিন্ন পর্যায়ে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকে এর সফল বাস্তবায়নে সহায়তা করে যাচ্ছে।

৩.২ খাদ্য সমৃদ্ধকরণের পথযাত্রা

ফরাসী (Persian) চিকিৎসক মেলানপাস (Melanpus) খৃষ্টপূর্ব ৪০০ সালে সর্বপ্রথম সৈনিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মদে (Wine) আয়রন সমৃদ্ধকরনে পরামর্শ দিয়েছেন। ১৮৩১ সালে ফ্রান্সের (French) চিকিৎসক বোসিনগল্ট (Boussingault) গলগণ্ড রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসার জন্য খাদ্যে আয়োডিনের অভাব মেটানোর লক্ষ্যে লবণের সাথে আয়োডিন মিশানোর পরামর্শ দেন। সেই ধারাবাহিকতায় পরবর্তিতে বিভিন্ন ধরনের অপুষ্টিজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব কমাতে বিভিন্ন দেশ-কাল এবং ভোক্তা বিবেচনায় মূল খাদ্যোপাদানের সাথে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সংযোজন করে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

ভিটামিন 'এ'-এর অভাবজনিত রাতকানা রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯১৭ সালে ডেনমার্কে এবং ১৯৪০ সালে যুক্তরাজ্যে মার্জারিনের (margarine) সঙ্গে ভিটামিন 'এ' মিশিয়ে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। একইভাবে গম ভাঙ্গানো এবং মিহিকরণের সময় নষ্ট হয়ে যাওয়া পুষ্টিমান পুনরুদ্ধারের জন্য থায়ামিন, নিকোটিনিক এসিড এবং লৌহজাতীয় পুষ্টি উপাদান সাদা ময়দা এবং সাদা রুটির সঙ্গে যোগ করা শুরু হয়। ক্যালসিয়ামের অভাব পূরণের জন্য রুটিতে ক্যালসিয়ামও যোগ করা হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাওয়া একটি রোগ হলো গলগণ্ড (goiter), যা বুদ্ধির স্বল্পতা এবং শারীরিক বিভিন্ন অসুস্থতা তৈরি করে। বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালে লবণের সঙ্গে আয়োডিন মেশানোর একটি কর্মসূচি, সিআইডিডি (CIDD) গ্রহণ করে।

সরকার ২০১২ সালে সর্বপ্রথম জাতীয় লবন নীতি এবং ২০২১ সালে আয়োডিনযুক্ত লবন আইন কার্যকর করে। এ আইনে ৩০-৫০ পিপিএম পটাশিয়াম আয়োডাইড (KIO_3) লবণের সঙ্গে মেশানোর কথা বলা হয়েছে যাতে ভোক্তাদের কাছে যাওয়া পর্যন্ত লবণে আয়োডিনের পরিমাণ ১৫-২০ পিপিএম অবশিষ্ট থাকে। ভিটামিন 'এ' এর অভাব মেটানোর জন্য সরকারিভাবে প্রতি ছয় মাস অন্তর অনধিক পাঁচ বছর বয়স্ক শিশুদের মাঝে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল বিতরণ করার ব্যবস্থা রয়েছে। তথাপি, বাংলাদেশে ২০১১-১২ এ পরিচালিত "ন্যাশনাল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সার্ভে" এর তথ্য অনুযায়ী বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর মাঝে ভিটামিন 'এ' এর অভাব রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বাংলাদেশে সরকার ২০১৩ সালে ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন (নং ৬৫, ২০১৩) প্রণয়ন করেছে, তদনুযায়ী ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ'' সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি চালু হয়েছে এবং বিধিমালা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন জোরদার করা হয়েছে।

"ন্যাশনাল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সার্ভে" (NMS) ২০১১-২০১২ অনুযায়ী অগর্ভবতী ও স্তন্যদানকারীনন (NPNL) এমন নারীদের মধ্যে ৭১.৫% এর ভিটামিন 'ডি' ঘাটতি রয়েছে। এ ঘাটতি প্রতিরোধে ভোজ্যতেলে একইসাথে ভিটামিন 'এ' এবং 'ডি' সমৃদ্ধকরণের জন্য জাতীয় অনুপুষ্টি ঘাটতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কৌশল ২০১৫-২০২৪-এ জোর দেয়া হয়েছে। এ উদ্যোগ বাংলাদেশে ভিটামিন 'ডি' এর ঘাটতি দূর করতে একটি নীতিগত পদক্ষেপ এবং বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সামগ্রিক প্রচেষ্টার প্রতিফলন।

৩.৩ অনুপুষ্টি ঘাটতি পূরণে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ

ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ লবণ তথা অনুপুষ্টি, যার অভাবকে 'সুপ্তক্ষুধা' (Hidden hunger) বলে অভিহিত করা হয়, এটি আমাদের দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, সুস্থতা ও কর্মক্ষম থাকার জন্য অত্যাবশ্যক। অনুপুষ্টি উপাদান অল্প পরিমানে প্রয়োজন হলেও এদের অভাব আমাদের দেহে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে, সুস্বাস্থ্য, বুদ্ধিমত্তা, দৈহিক ও মানবিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শুধু বাংলাদেশে নয় বিশ্বব্যাপী প্রায় ২ বিলিয়ন মানুষ অনুপুষ্টির ঘাটতিতে ভুগছে, যার এক তৃতীয়াংশেরও বেশি অন্তত একটি মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের ঘাটতির ঝুঁকিতে রয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় ২৫% মানুষ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে এবং অনুপুষ্টির ঘাটতি একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ২০১১-১২ সালের "ন্যাশনাল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সার্ভে" (NMS) অনুযায়ী, দেশের সকল স্তরের (জাতীয় ও উপ-জাতীয়) অ-গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী নন (NPNL) এমন নারীদের মধ্যে ব্যাপক পুষ্টি ঘাটতি দেখা গেছে, যা একটি বিস্তৃত পুষ্টি হস্তক্ষেপ কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। বিশেষ করে, বস্তিতে বসবাসকারী NPNL নারীদের মধ্যে ভিটামিন বি$_{১২}$, ভিটামিন **'এ'** এবং জিঙ্কের ঘাটতি বেশি লক্ষ্য করা গেছে।

ভিটামিন বি$_{১২}$, ফোলেট ও জিঙ্কের উচ্চ ঘাটতি জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য সমৃদ্ধকরণের মাধ্যমে এই পুষ্টি উপাদানগুলোর যোগান নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। বৃহৎ পরিসরে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ (Large Scale Food Fortification) এবং জৈব সমৃদ্ধকরণ (Biofortification) কেবল অনুপুষ্টির ঘাটতি পূরণের সোনালি সুযোগ নয়, বরং এটি খাদ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে সবার জন্য স্বাস্থ্যকর খাদ্য সরবরাহ করার একটি ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপনা। বাংলাদেশের খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ উপাদান সরবরাহ নিশ্চিত করা, যাতে পুষ্টিগত ঘাটতি প্রতিরোধ করা যায়।

জাতীয় এবং উপ-জাতীয় স্তরে "ন্যাশনাল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সার্ভে" ২০১৯-২০ এ NPNL নারীদের মধ্যে ভিটামিন **'এ'** এর ঘাটতির হার তুলনামূলকভাবে কম (৫.৪%) দেখা গেছে। সম্ভবত এর কারণ হলো, জাতীয়ভাবে ভোজ্যতেল সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি চালুর কয়ের বছর পর এই জরিপ পরিচালিত হয়েছিল, যা ভিটামিন **'এ'** ঘাটতি হ্রাসে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

৩.৪ খাদ্য সমৃদ্ধকরণ পদ্ধতি

খাদ্য সমৃদ্ধকরণের পদ্ধতি চার ভাগে বিভক্ত করা যায়-

১) শিল্পভিত্তিক খাদ্য সমৃদ্ধকরণ: এই প্রক্রিয়ায় খাদ্যের সাথে নির্বাচিত অনুপুষ্টি উপাদান (ভিটামিন **'এ'** আয়রন, জিঙ্ক ইত্যাদি নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত করা হয়। যেমন- পুষ্টি আটা, পুষ্টি বিস্কুট, পুষ্টি তেল, পুষ্টি চাল ইত্যাদি শিল্প ভিত্তিক সমৃদ্ধকরণের মাধ্যমে উৎপাদন করা হয়।

২) জৈব সমৃদ্ধকরণ: জৈব পদ্ধতিতে খাদ্যের গঠন ও বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার সাথে অনুপুষ্টি উপাদানের সংযোগ ঘটানোকে জৈব খাদ্য সমৃদ্ধকরণ বা বায়ো-ফর্টিফিকেশন বলা হয়। ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ মিষ্টি আলু, জিঙ্ক সমৃদ্ধ ধান, ডাল ইত্যাদি এ ধরণের খাদ্য সমৃদ্ধকরণের উদাহরণ।

৩) খাদ্য থেকে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ (F_tFF): এক বা একাধিক অপুষ্টিসবল অথবা পুষ্টি দূর্বল খাবার এক সংগে নির্দিষ্ট পরিমণে বা অনুপাতে মিশ্রিত করলে উক্ত খাবারে উল্লেখযোগ্য পুষ্টিমানের পরিবর্তন হয়। এবং জৈব্য উপলভ্যতা বৃদ্ধি বা সমন্বয় হয়। এই পদ্ধতিতে সাধারণত: শক্তি, চর্বি, আমিষ, আঁশ, শর্করা, ভিটামিন ও খনিজ দ্রব্য সমৃদ্ধ/সমন্বয় করা হয়।

৪) ব্যবহারের স্থান/বাড়িতে সমৃদ্ধকরণ (Point of use/Home fortification): এক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সম্পূরক পুষ্টি উপাদান খাবরের সাথে মিশ্রিত করা হয় যেমন- ভিটামিন 'ডি' ড্রপস, অনুপুষ্টি পাউডার (MNP), বিশেষত: ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ ও আয়রন সমৃদ্ধ করা হয়।

৩.৫ খাদ্য সমৃদ্ধকরণ প্রকারভেদ

অপুষ্টিজনিত সমস্যার প্রকৃতি ও ভূক্তভুগীদের ব্যাপকতা বিবেচনাপূর্বক অধিকতর উপযোগী ও কার্যকর মাধ্যম নির্বাচন করে লক্ষ্য জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত তিনটি উপায়ে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ করা যায়:

ক) সর্বজনীন খাদ্য সমৃদ্ধকরণ (Mass Fortification)

খ) লক্ষ্য জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সমৃদ্ধকরণ (Targeted Fortification)

গ) বাজার-চাহিদা মোতাবেক অনুপুষ্টি ঘাটতি পূরণের জন্য খাদ্য সমৃদ্ধকরণ (Market Driven Fortification)

নিম্নে খাদ্য সমৃদ্ধকরণের প্রকারভেদ সংক্ষেপে বর্ননা করা হলো-

ক) সর্বজনীন **খাদ্য সমৃদ্ধকরণ (Mass Fortification)**

সর্বস্তরের মানুষের জন্য সাধারণত দৈনিক ব্যবহৃত প্রধান খাদ্যদ্রব্য যেমন - চাল, আটা, ভোজ্যতেল বা লবণকে নির্দিষ্ট কিছু অনুপুষ্টি উপাদান (যেমন: আয়রন, জিঙ্ক, ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন এ ও ডি) দিয়ে সমৃদ্ধ করাকে সর্বজনীন খাদ্য সমৃদ্ধকরণ বলা হয়। এটি বড় মাপের খাদ্য সমৃদ্ধকরণ (LSFE) পদ্ধতি নামে পরিচিত। অপুষ্টিজনিত রোগ প্রতিরোধে এটি একটি অত্যন্ত কার্যকর কৌশল। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যখন কোন সুনির্দিষ্ট অনুপুষ্টি উপাদানের ঘাটতি এবং তজ্জনিত স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগে তখন তা নিরসনে এই ধরণের খাদ্য সমৃদ্ধকরণ সর্বোত্তম পন্থা হিসেবে স্বীকৃত। সর্বজনীন খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সমাজের সকল স্তরের মানুষ, বিশেষ করে যারা পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে পারে না, তারাও সহজে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পেতে পারে। এটি দীর্ঘমেয়াদী জনস্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে এবং অপুষ্টির কারণে সৃষ্ট জটিলতা হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন কৌশলটি জনগণের মাঝে অনুপুষ্টির অভাব নিরসনের জন্য সরকার কর্তৃক বাধ্যতামূলক (Mandated) ও নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক।

খ) লক্ষ্য জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সমৃদ্ধকরণ (Targeted Fortification)

লক্ষ্য জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সমৃদ্ধকরণ হলো একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে তারা সাধারণত প্রতিদিন যে সকল খাবার খায় অর্থাৎ চাল, তৈল ও লবণ ইদ্যাদি খাদ্যে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ তথা অনুপুষ্টি যোগ করার প্রক্রিয়া। সর্বজনীন সমৃদ্ধকরণের বিপরীতে এই পদ্ধতিটি সবার জন্য প্রযোজ্য নয়, বরং এটি গর্ভবতী নারী, শিশু, বা নির্দিষ্ট রোগের শিকার ব্যক্তিদের মতো নির্দিষ্ট পুষ্টি ঘাটতিতে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে পরিচালিত হয়। সাধারণত, এই পদ্ধতিতে বিশেষ পুষ্টি সম্পূরক (যেমন: আয়রন, ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট, ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল) অথবা তাদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি খাদ্যপণ্যে পুষ্টি উপাদান যুক্ত করা হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো ওই নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজমান পুষ্টিহীনতা দ্রুত ও কার্যকরভাবে মোকাবেলা করে তাদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা, সুরক্ষা ও সার্বিক বিকাশে সহায়তা করা। উদাহরণ হিসেবে নবজাতকের সম্পূরক খাদ্য, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম, গর্ভবতী নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ বিস্কুট এবং বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য রেশন প্রোগ্রাম ইত্যাদি বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। বিগত দশক থেকে বাংলাদেশে গর্ভবতী নারী ও শিশুদের জন্য বহু উপাদানে সমৃদ্ধ অনুপুষ্টি পাউডার (মাল্টিপল

মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট পাউডার-এমএনপি) এবং সম্পূরকীকরণ (সাপ্লিমেন্টেশন) কার্যক্রম চলছে। বহু উপাদান বিশিষ্ট অনুপুষ্টি পাউডার মিশিয়ে শিশুদের ঘরে খাওয়া খাবারে প্রয়োজনীয় অনুপুষ্টি দিয়ে সমৃদ্ধকরণ করা হয়। এছাড়া কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে লক্ষ্য জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণে সীমিত আকারে পুষ্টি সমৃদ্ধ চাল বিতরণ চলমান রয়েছে।

গ) বাজার-চাহিদা মোতাবেক অনুপুষ্টি ঘাটতি পূরণের **জন্য খাদ্য সমৃদ্ধকরণ (Market Driven Fortification)**

এই প্রক্রিয়া অনুযায়ী খাদ্য উৎপাদনকারীরা ভোক্তার চাহিদা বা পছন্দকে মুল্যায়ন করে তাদের পণ্যে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ যুক্ত করে। এখানে অনুপুষ্টির ঘাটতি পূরণের পাশাপাশি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যও জড়িত থাকে। অর্থাৎ, ভোক্তারা পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাবার কিনতে আগ্রহী হওয়ায় কোম্পানিগুলো তাদের পণ্যের মান বাড়াতে এবং বাজারে প্রতিযোগিতা ও সক্ষমতা বজায় রাখতে খাদ্য সমৃদ্ধকরণের পথ বেছে নেয়। এই প্রক্রিয়ায় প্রায়শই সকালের নাস্তায় খাওয়ার উপযোগী শস্য (breakfast cereals), দুগ্ধজাত পণ্য, দধি (ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ), ফলিক এসিড সমৃদ্ধ পাউরুটি, ভিটামিন ‘সি’ সমৃদ্ধ ফলের রস, ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ নুডুলস, পানীয় বা প্রক্রিয়াজাত হালকা নাস্তা জাতীয় মুখরোচক খাবারকে সমৃদ্ধ করা হয়। এর ফলে, একদিকে যেমন ভোক্তারা পুষ্টিকর খাদ্যের বিকল্প পায়, তেমনি অন্যদিকে খাদ্য শিল্পের বিকাশ ঘটে এবং পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

৩.৬ খাদ্য সমৃদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার জন্য বিশেষ বিবেচ্য বিষয়সমূহ

খাদ্য সমৃদ্ধকরণ অপুষ্টি মোকাবেলায় বিশ্ব স্বীকৃত কার্যকর কৌশল বিধায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (WFP), জাতিসংঘের ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন (FAO) ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা ও কৌশলপত্রসমূহ খাদ্য সমৃদ্ধকরণে অবশ্য বিবেচ্য। এই নীতিমালা ও কৌশলসমূহ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে-

- খাদ্য সমৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে এমন একটি খাদ্যকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করতে হবে যা জনগোষ্ঠীর প্রায় সকলেই কম বেশী নিয়মিত গ্রহণ করে থাকে;
- এটি একটা গণমূখী উদ্যোগ যার উপকারভোগী সকল জনগোষ্ঠী;
- এটি মূল্য সাশ্রয়ী এবং তুলনামূলকভাবে দ্রুত প্রয়োগ করা সম্ভব;
- এটি একটা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং দীর্ঘ মেয়াদে এর প্রভাব কার্যকর থাকবে;
- এটি নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট এবং স্বাস্থ্যসম্মত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কারখানায় উৎপাদিত হতে হবে;
- এতে জনগোষ্ঠীর খাদ্যাভাসে কোন পরিবর্তন আনার প্রয়োজন নেই;
- এতে খাদ্যের বৈশিষ্ট্যের (স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ ইত্যাদি) কোন পরিবর্তন হয় না;
- এতে অনুপুষ্টির অভাব দূরিকরণে খাদ্য নির্ভর (Food Based) কৌশলকে অধিকতর প্রাধান্য দেয়া হয়;
- এই প্রক্রিয়ায় সরকার, প্রক্রিয়াজাতকারী ও অন্যান্য অংশীজনকে সম্পৃক্ত করতে হবে; এবং
- এই প্রক্রিয়াতে জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব নিয়মিত পর্যবেক্ষণ (Monitoring) ও মূল্যায়ন (Evaluation) করতে হবে।

৩.৭ খাদ্য সমৃদ্ধকরণের জন্য উপযুক্ত খাদ্য নির্বাচন

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় খাদ্য সমৃদ্ধকরণের সুফল পেতে হলে উপযুক্ত খাদ্য বাহন নির্বাচন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। খাদ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট এজেন্সি প্রণীত নীতিমালা ও সুপারিশসমূহ অনুসরণ করতে হবে। উপযুক্ত খাদ্য বাহন নির্বাচনে সাধারনত যে সমস্ত মানদণ্ড বিবেচনা করা হয় তা নিম্নে প্রদান করা হলো:

- যে খাদ্যকে সমৃদ্ধ করা হবে, তা অবশ্যই জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য, সাশ্রয়ী এবং নিয়মিত ও বহুল ব্যবহৃত হতে হবে;
- সাধারণত, চাল, আটা, ভোজ্যতেল, লবণ, এবং দুগ্ধজাত পণ্যের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যগুলো সমৃদ্ধকরণের জন্য আদর্শ;
- যে খাবারগুলো সমাজের সকল স্তরের মানুষ, বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠী, নিয়মিত গ্রহণ করে;
- নির্বাচিত খাদ্য এমন হওয়া উচিত যাতে প্রদত্ত পুষ্টি উপাদানগুলো রান্নার সময় বা সংরক্ষণে তাদের কার্যকারিতা না হারায়;
- খাদ্যের রঙ, গন্ধ বা স্বাদের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে না এমন খাদ্য নির্বাচনও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর ওপর ভোক্তাদের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে;
- কাঙ্ক্ষিত জনগোষ্টির কাছে সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী হতে হবে;
- পুষ্টি উপাদান সহজে দেহে শোষিত এবং জৈবিক ব্যবহার হয়; এবং
- খাদ্যের অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের উপর কোন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে না।

৩.৮ খাদ্য সমৃদ্ধকরণের জন্য যা প্রয়োজন

- **নীতিমালা ও আইন** – খাদ্য সমৃদ্ধকরণ সম্পর্কিত সরকারি নির্দেশনা, মানদণ্ড, আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন ও প্রচার।
- **উপযুক্ত বাহক নির্বাচন** –যেমন: লবণ, ভোজ্যতেল, চাল, গমের আটা, দুগ্ধজাত সামগ্রী ইত্যাদি আদর্শ বাহক।
- **সমৃদ্ধকরণ উপাদান (ফর্টিফিকেন্ট)** – আয়রন, জিঙ্ক, ভিটামিন 'এ', ভিটামিন 'ডি', ফোলেটসহ অন্যান্য অত্যাবশ্যক ও অতি গুরুত্বপূর্ণ অণুপুষ্টি উপাদান সংগ্রহ অথবা উৎপাদন।
- **প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি** – সমৃদ্ধকরণ ও মাননিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, মেশানোর প্রযুক্তি উদ্ভাবন অথবা অভিযোজন (Adaption)।
- **মান নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি** – উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ পর্যায়ে নিয়মিত মান নিয়ন্ত্রণ ও মান নিশ্চিতকরণে নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নজরদারি।
- **লেবেলিং ও চিহ্ন** – মোড়কে পুষ্টি তথ্য, সমৃদ্ধকরণ চিহ্ন ও নির্দেশনা প্রদান।
- **প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম** –উৎপাদনকারী, বাজারজাতকারী, ভোক্তা ও অন্যান্য অংশীজনদের প্রশিক্ষণ, প্রচার ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণ।
- **অর্থায়ন ও সহযোগিতা** – সরকার, বেসরকারি খাত ও আর্ন্তজাতিক ও উন্নয়ন সংস্থার অংশীজনদের সমন্বিত ভূমিকা।
- **গবেষণা ও মূল্যায়ন** – খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরবর্তী জনস্বাস্থ্যের উপর এর প্রভাব মূল্যায়ন, তথ্য সংগ্রহ ও উন্নয়নমূলক গবেষণা পরিচালনা এবং প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ।
- **সেমিনার ও কর্মশালা-** সমৃদ্ধকরণের বর্তমান অবস্থা ও গুরুত্বের উপর জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন।

৩.৯ খাদ্য সমৃদ্ধকরণের সীমাবদ্ধতা

খাদ্য সমৃদ্ধকরণ জনস্বাস্থ্যের উন্নতিতে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হলেও এর কিছু অন্তর্নিহিত **সীমাবদ্ধতা** রয়েছে, যা কার্যকর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে:

- **সকল জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে ব্যর্থতা:** খাদ্য সমৃদ্ধকরণ ব্যবস্থা প্রায়শই বাজারভিত্তিক হয়। এর ফলে, যারা সবচেয়ে দরিদ্র এবং খাদ্য কিনতে অসমর্থ, তাদের কাছে এই সমৃদ্ধকৃত খাদ্য পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়ে। তাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণে অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির প্রয়োজন হয়।
- **সীমিত পুষ্টি উপাদান যোগ করা:** সমৃদ্ধকরণের মাধ্যমে সাধারণত এক বা কয়েকটি নির্দিষ্ট অনুপুষ্টি উপাদান খাদ্যে যোগ করা সম্ভব হয়। একটি খাদ্যে সব ধরনের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করা প্রায়শই সম্ভব হয় না।
- **অ-সমৃদ্ধকৃত খাদ্যের ব্যবহার:** যারা সমৃদ্ধকৃত খাদ্য গ্রহণ করেন না (যেমন: যারা নিজের জমিতে উৎপন্ন শস্য খান বা স্থানীয়, প্রক্রিয়াজাত নয় এমন খাবার বেশি গ্রহণ করেন), তারা এই কর্মসূচির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। প্রত্যন্ত অঞ্চল বা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে এটি একটি সাধারণ সমস্যা।
- **প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রকল্প-** যদিও খাদ্য সমৃদ্ধকরণের মাধ্যমে অতিরিক্ত অনুপুষ্টি উপাদান, সরবরাহ করা যায় তবুও এটি ভালো মানের প্রাকৃতিক খাদ্যের বিকল্প হতে পারবে না।
- **অতিরিক্ত পুষ্টি গ্রহণের ঝুঁকি (Over-fortification):** যদি একই ব্যক্তি একাধিক সমৃদ্ধকৃত খাবার খায় অথবা সমৃদ্ধকৃত খাবারের পাশাপাশি পুষ্টি সম্পূরকও গ্রহণ করে, এমতাবস্থায় কিছু পুষ্টি উপাদানের অতিরিক্ত মাত্রায় গ্রহণের ঝুঁকি থাকে। এটি বিশেষত তেলে-দ্রবণীয় ভিটামিন (যেমন: ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি) বা কোন কোন খনিজ পদার্থের (যেমন: আয়রন) ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হতে পারে।

  অতিরিক্ত পুষ্টি গ্রহণের ঝুঁকি (Over-fortification): খাদ্য সমৃদ্ধকরণ এমন একটি বিশ্ব স্বীকৃত কৌশল যা বিশ্বব্যাপী ব্যাপক গবেষণা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে খাদ্যে অনুপুষ্টি মিশ্রণের একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে। মানবদেহের জন্য যে পরিমান অনুপুষ্টি প্রয়োজন তার এক তৃতীয়াংশ অনুপুষ্টি সংযোজন করে খাদ্য সমৃদ্ধ করা এই মানদণ্ডের অন্যতম প্রধান সূচক। অর্থাৎ সমৃদ্ধকৃত খাদ্য মানুষের অনুপুষ্টি চাহিদার এক তৃতীয়াংশ পূরণে সক্ষম। ফলে একাধিক সমৃদ্ধকৃত খাবার গ্রহণের ফলে অতি মাত্রায় পুষ্টি গ্রহণের সম্ভাবনা খুব কম বা সেই আশঙ্কা থাকে না।
- **ভোক্তার গ্রহণযোগ্যতা ও অপছন্দ:** অনেক সময়, খাদ্যে পুষ্টি উপাদান যোগ করার ফলে এর স্বাদ, গন্ধ বা রঙের সামান্য পরিবর্তন হতে পারে। এটি যদি ভোক্তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য না হয়, তখন তারা সমৃদ্ধকৃত খাদ্য গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হতে পারে, যার ফলে কর্মসূচির উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।
- **প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ ও ব্যয়:** খাদ্য সমৃদ্ধকরণ একটি **প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া**, যার জন্য সঠিক অবকাঠামো, মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং নিয়মিত তদারকি আবশ্যক। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই প্রক্রিয়া স্থাপন, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়বহুল হতে পারে। প্রক্রিয়াকরণ যথাযথ ও মান সম্মত না হলে পুষ্টি উপাদানের কার্যকারিতা হ্রাস পেতে পারে।
- **আইনি ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো:** খাদ্য সমৃদ্ধকরণের জন্য একটি কার্যকর আইনি ও শক্তিশালী নিয়ন্ণন কাঠামো থাকা জরুরি, যা পুষ্টি উপাদানের মাত্রা, গুণগত মান এবং লেবেলিং নিশ্চিত করবে। এই কাঠামো দূর্বল হলে কর্মসূচির কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।

- **জনগোষ্টির অতিমাত্রায় দরিদ্রতা:** অপ্রতুল এবং সনাতন খাদ্যগ্রহণের ফলে তাদের বহুবিধ অপুষ্টি থাকে যা শুধুমাত্র খাদ্য সমৃদ্ধকরণের মাধ্যমে নিরসন করা সম্ভব নয়।
- **সমৃদ্ধকৃত খাদ্যের সংরক্ষণে অজ্ঞতা:** নির্ধারিত তাপমাত্রায় এবং পরিবেশে কতদিন সংরক্ষণ করা যাবে এ বিষয়ে ভোক্তাদের অজ্ঞতা রয়েছে।

এই সীমাবদ্ধতাগুলো থাকা সত্ত্বেও, সঠিক পরিকল্পনা, যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বিত পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ জনস্বাস্থ্যের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৩.১০ দেশ ভিত্তিক খাদ্য সমৃদ্ধকরণের বিবরণ

খাদ্য সমৃদ্ধকরনের জন্য বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে কোন খাদ্যে কি প্রকারের অনুপুষ্টির অভাব বয়েছে তা নির্ণয় করা গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের কতিপয় দেশে কোন অনুপুষ্টি উপাদান নিয়ে কি কি খাদ্য সমৃদ্ধকৃত করা হয় তার বিবরণ খাদ্য প্রদান করা হলো:

দেশ	সমৃদ্ধকৃত খাদ্য	অনুপুষ্টি উপাদান
বাংলাদেশ	লবণ	আয়োডিন
	ভোজ্য তেল	ভিটামিন এ
	বিস্কুট	ভিটামিন এ, ভিটামিন বি কমপ্লেক্সসহ ১৪ টি অনুপুষ্টি উপাদান
	চাল	ভিটামিন এ, ভিটামিন বি ১, ২, ১২, আয়রন, জিঙ্ক ও ফলিক এসিড
	আটা	ক্যালসিয়াম, আয়রন, থিয়ামিন, রিবোফ্লাভিন, নিয়াসিন, পাইরিডক্সিন, ভিটামিন বি১২, জিঙ্ক, ভিটামিন এ, ফলিক এসিড
ভারত	বনস্পতি, মার্জারিন	ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি rice, wheat, oil, milk and salt
	চাল	আয়রন
পাকিস্তান	ঘি, বাটার	ভিটামিন এ
	গমের আটা (Mandatory)	আয়রন, ফলিক এসিড, ভিটামিন বি
	ভোজ্যতেল/ঘি (Mandatory)	ভিটামিন 'এ' এবং 'ডি'
	লবণ (voluntary)	আয়োডিন
	চাল (voluntary)	আয়রন, ফলিক এসিড, ভিটামিন এ, জিঙ্ক
ফিলিপিন	মার্জারিন	ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি, ভিটামিন বি১
	ভোজ্য তেল	ভিটামিন এ
	চাল	আয়রন
ইন্দোনেশিয়া	ময়দা ও ন্যুডুলস	ভিটামিন বি১, ভিটামিন বি২, আয়রন, জিঙ্ক

	মার্জারিন	ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি
	ভোজ্য তেল	ভিটামিন এ
ব্রাজিল	স্কিমড মিল্ক, শিশুর খাবার	ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি
চিলি	আটা	ভিটামিন বি১, ভিটামিন বি২, নিয়াসিন, ফলিক এসিড, আয়রন
	পাস্তা	ভিটামিন বি১, ভিটামিন বি২, নিয়াসিন, আয়রন
	মার্জারিন	ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি
কলম্বিয়া	আটা	ভিটামিন বি১, ভিটামিন বি২, নিয়াসিন, ফলিক এসিড, আয়রন
	মার্জারিন	ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি
	চাল	ভিটামিন এ, ভিটামিন বি১, ভিটামিন বি৩, ভিটামিন বি৬, ভিটামিন বি১২ ফলিক এসিড
বলিভিয়া	আটা	ভিটামিন বি১, ভিটামিন বি২, নিয়াসিন, ফলিক এসিড, আয়রন
	ভোজ্য তেল	ভিটামিন এ
	চাল	ভিটামিন এ, ভিটামিন বি১, ভিটামিন বি৩, ভিটামিন বি৬, ভিটামিন বি৯, ভিটামিন বি১২, আয়রন, জিঙ্ক
গুয়েতেমালা	আটা	ভিটামিন বি১, ভিটামিন বি২, নিয়াসিন, ফলিক এসিড, আয়রন, ক্যালসিয়াম
	পাস্তা	ভিটামিন বি১, ভিটামিন বি২, নিয়াসিন, আয়রন
	স্কিমড মিল্ক	ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি
	মার্জারিন, চিনি	ভিটামিন এ
কোস্টারিকা	আটা	ভিটামিন বি১, ভিটামিন বি২, নিয়াসিন, ফলিক এসিড, আয়রন
	চিনি	খিটামিন এ
ইকুয়েডর	আটা	ভিটামিন বি১, ভিটামিন বি২, নিয়াসিন, ফলিক এসিড, আয়রন
	মার্জারিন	ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি
হন্ডুরাস	আটা	ভিটামিন বি১, ভিটামিন বি২, নিয়াসিন, ফলিক এসিড, আয়রন, ক্যালসিয়াম
	মিল্ক, মার্জারিন	ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি
	চিনি	ভিটামিন এ
ডোমিনিকান রিপাবলিক	আটা	ভিটামিন বি১, ভিটামিন বি২, নিয়াসিন, ফলিক এসিড, আয়রন

চতুর্থ অধ্যায়

৪.০ খাদ্য সমৃদ্ধকরণে ব্যবহৃত অনুপুষ্টি উপাদানসমূহ

৪.১ আয়োডিন ও আয়োডিন দিয়ে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ

আয়োডিন মানবদেহের জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় খনিজ অনুপুষ্টি উপাদান, যা থাইরয়েড গ্রন্থির সঠিক কার্যকারিতার জন্য অপরিহার্য। এই গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত থাইরয়েড হরমোন (যেমনঃ থাইরক্সিন) শরীরের বিপাক প্রক্রিয়া, বৃদ্ধি, বিকাশ এবং স্নায়ুতন্ত্রের সঠিক কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে। বিশেষ করে শিশু ও গর্ভবতী নারীদের জন্য আয়োডিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর অভাবে শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ ব্যাহত হতে পারে, গর্ভকালীন নানা জটিলতা দেখা দিতে পারে এবং শিশুর সামগ্রিক বিকাশ ও বর্ধন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আয়োডিন দ্বারা লবণ সমৃদ্ধ করণ এবং খাদ্যের সাথে গ্রহণ জনগণের মধ্যে আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি ডিজঅর্ডার (IDD) এর ঝুঁকি কমনোর জন্য একটি বিশেষ উপায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আইডিডি নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বজনীন লবণ আয়োডাইজেশন একটি জনপ্রিয় এবং কার্যকরী কর্মসূচী। আয়োডিন থাইরয়েড হরমোন উৎপাদনে, বিপাক নিয়ন্ত্রণে, শারীরিক ও মানসিক বিকাশে এবং প্রজনন স্বাস্থ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৪.১.১ আয়োডিনের খাদ্য উৎস ও গ্রহণের মাত্রা

ক) খাদ্য উৎস: সামুদ্রিক মাছ ও শৈবাল, সিদ্ধ ডিম, দই, মাখন, কলিজা, সীম (lima bean), টুনা ও কড মাছ, চিংড়ী, ক্র্যানবেরি, আলুবোখারা এবং আয়োডিনযুক্ত লবণ হলো আয়োডিনের প্রধান উৎস। বাংলাদেশ ব-দ্বীপ অঞ্চল হওয়ায় মাটি থেকে আয়োডিন ধুয়ে যায়, তাই খাদ্যসূত্রে আয়োডিনের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।

খ) প্রতিদিন আয়োডিন গ্রহণের মাত্রা:

ক্রমিক নং	বয়স	আয়োডিন গ্রহণের মাত্রা
০১.	নবজাত শিশু (০-১১ মাস)	৫০ মাইক্রোগ্রাম
০২.	শিশু (১২-৫৯ মাস)	৯০ মাইক্রোগ্রাম
০৩.	বালক/বালিকা (৬-১২ বছর)	১৫০ মাইক্রোগ্রাম
০৪.	প্রাপ্ত বয়স্ক	৯৫ মাইক্রোগ্রাম
০৫.	গর্ভবতি, স্তন্যদানকারী নারী	২০০ মাইক্রোগ্রাম

একজন মানুষের ৭০ বছরে মাত্র ৫ গ্রাম আয়োডিনের প্রয়োজন হয় যা এক চা চামচে ধারণ করা সম্ভব।

৪.১.২ আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা

আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড, হাইপোথাইরয়েডিজম, শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হওয়া, এমনকি বামনত্বও হতে পারে। গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে গর্ভপাত, মৃত সন্তান জন্মদান বা বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হওয়ার ঝুঁকি থাকে। এছাড়া মানসিক অস্থিরতা, বুদ্ধিহীনতা, ক্লান্তি, অস্বাভাবিক ওজন বৃদ্ধি, শুষ্ক ত্বক, চুল পড়া, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশজনিত সমস্যা, বোবা, কালা, ট্যারা, প্রতিবন্ধিত্ব এবং কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৪.১.৩ লবণে আয়োডিন পরীক্ষা পদ্ধতি

অতি সহজেই লবণে আয়োডিনের উপস্থিতি পরীক্ষা করা যায়। এক চামচ লবণের সাথে পাঁচটি ভাতের দানা চটকে তাতে দু'ফোঁটা লেবুর রস দিলে যদি ভাতের রঙ **বেগুনী** হয়, তবে বুঝতে হবে লবণে আয়োডিন আছে। রাসায়নিক পদ্ধতিতে (RTK এবং টাইট্রেশন)

লবণের আয়োডিনের গুণগত মান নির্ণয় করা হয়। ১৫ পিপিএম বা তার বেশি আয়োডিন থাকলে তা পর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হয়। (পিপিএম হলো "পার্টস পার মিলিয়ন"(PPM)। এটি পরিমাপের একটি একক যা মিশ্রণে পদার্থের ঘনত্ব প্রকাশ করে।)

৪.১.৪ আয়োডিন দিয়ে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট

আয়োডিনের ঘাটতিজনিত ব্যাধি (IDD) প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৯ সালে **সর্বজনীন লবণ আয়োডাইজেশন (USI)** কৌশল গ্রহণ করে। এর আওতায় "আয়োডিনের ঘাটতিজনিত ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ আইন" প্রণীত হয়, যেখানে মানব খাদ্যে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত লবণে প্রক্রিয়াকরণের সময় ৪৫-৫০ পিপিএম এবং খুচরা বিক্রেতা পর্যায়ে কমপক্ষে ২০ পিপিএম আয়োডিন থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটি)আই কর্তৃক আয়োডিনযুক্ত লবণের স্ট্যান্ডার্ড হলো উৎপাদন পর্যয়ে ৩০-৫০ পিপিএম এবং সরবরাহ পর্যয়ে ২০-৫০ পিপিএম।

তবে, ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী (২০২১), বিশ্বব্যাপী আয়োডিনযুক্ত লবণ গ্রহণের হার ৮৯%। বাংলাদেশে শিল্পভাবে আয়োডিনযুক্ত লবণ প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্যের ব্যবহার প্রায় ৭৫.৫%। এর অর্থ হলো, এখনও প্রায় ২৪.৫% জনগোষ্ঠী এই কর্মসূচির আওতার বাইরে থাকছে, বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম এবং সুদূর দক্ষিণের কক্সবাজারের মতো কিছু অঞ্চলে পারিবারিক স্তরে আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারে অনিহা রয়েছে। বাজারের কমমূল্যে প্যাকেটবিহীন খোলা লবণের সহজলভ্যতা এর অন্যতম কারন। তাই বাজারে খোলা লবণ বিক্রয় বন্ধের পদক্ষেপ গ্রহেণ এবং আয়োডিন সমৃদ্ধ লবণ ব্যবহারের জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরী।

৪.২ ভিটামিন ‘এ’ দিয়ে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ

বাংলাদেশে জনসংখ্যার একটি উল্ল্যেযোগ্য অংশ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করার কারণে শুধু খাদ্যের মাধ্যমে শরীরের জন্য প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় পুষ্টি পূরণ করা তাদের পক্ষে সম্ভাব হয় না। তাদের বেশির ভাগই ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবে সৃষ্ট রোগব্যাধিতে আক্রান্ত এবং এর চিকিৎসা করাও তাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য National Micronutrition Survey 2011-2012 অনুযায়ী বাংলাদেশে ২০.৫ শতাংশ প্রাক স্কুল শিশু (৬-৫৯ মাস বয়সী), ২০.৯ শতাংশ স্কুলগামী শিশু (৬-১১ বছর বয়সী), ২৩.৭ শতাংশ গর্ভবতী নারী এবং ১৪ শতাংশ দুগ্ধদানকারী নারী ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবে ভুগছে। বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া খাদ্যের মধ্যে প্রাণিজ খাদ্যে যথেষ্ট পরিমান উৎকৃষ্ট ভিটামিন ‘এ’ থাকে, যা দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী জনগণের পক্ষে প্রতিদিনের জন্য তালিকায় রাখা সম্ভব হয় না। তাই দেশের সকল জনগণের প্রয়োজনীয় ভিটামিন ‘এ’ এর অভাব পূরণ করার জন্য খাদ্য সমৃদ্ধকরণের প্রয়োজন রয়েছে।

৪.২.১ ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবজনিত সমস্যা

ভিটামিন **‘এ’** এর অভাবে বিভিন্ন গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে। এর অভাবে রাতকানা, জেরোফথালমিয়া (যা স্থায়ী অন্ধত্ব ঘটাতে পারে), রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া (হাম, ডায়রিয়া, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণের ঝুঁকি বৃদ্ধি), রক্তস্বল্পতা, শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া, ত্বকের সমস্যা, প্রজনন সমস্যা এবং ক্ষত নিরাময়ে বিলম্ব হতে পারে। গুরুতর ক্ষেত্রে মৃত্যুঝুঁকিও বাড়ে।

৪.২.২ ভিটামিন ‘এ’ এর উৎস ও প্রয়োজনীয় মাত্রা

ভিটামিন **‘এ’** প্রাণীজ (গরু, মুরগি, খাসির কলিজা, ডিম, ছোট মাছ, দুধ) এবং উদ্ভিজ্জ (গাঢ় সবুজ শাকসবজি যেমন- পালং শাক, লাল শাক; রঙ্গিন সবজি যেমন গাজর, মিষ্টি কুমড়া; রঙ্গিন ফল যেমন- পাকা আম, পাকা পেঁপে) উভয় উৎস থেকেই পাওয়া যায়।

বয়স ও লিঙ্গভেদে এর দৈনিক প্রয়োজনীয় মাত্রা ভিন্ন হয়। যেমন, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের জন্য ৩০০-৪০০ মাইক্রোগ্রাম এবং গর্ভবতী নারীদের জন্য ৪৫০ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন **'এ'** প্রয়োজন।

৪.২.৩ বাংলাদেশে ভিটামিন 'এ' দিয়ে ভোজ্যতেল সমৃদ্ধকরণ

বাংলাদেশে খাদ্যে বৈচিত্র্যের অভাব, অপর্যাপ্ত তেল ও চর্বি, প্রাণীজ খাদ্য, ফল ও সবজির স্বল্প গ্রহণ এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী ২৫% জনগোষ্ঠীর কারণে ভিটামিন **'এ'** এর অভাব একটি বড় জনস্বাস্থ্য সমস্যা। যদিও শিশুদের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল বিতরণ করা হয়, এটি স্থায়ী সমাধান নয়।

খাদ্যকে ভিটামিন **'এ'** দ্বারা সমৃদ্ধ (ফর্টিফাই) করা একটি টেকসই ও সাশ্রয়ী উপায়, যা অধিক সংখ্যক মানুষের কাছে সহজে এই পুষ্টি উপাদান পৌঁছাতে পারে এবং শিশু ও নারীদের পুষ্টি পরিস্থিতি উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশে ভিটামিন **'এ'** সমৃদ্ধকরণের জন্য **ভোজ্যতেল** একটি আদর্শ মাধ্যম, কারণ এটি দৈনন্দিন রান্নায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় (একজন ব্যক্তি গড়ে প্রতিদিন ২০.৫১ গ্রাম ভোজ্যতেল গ্রহণ করে)। ভোজ্যতেলে ভিটামিন **'এ'** যোগ করা সহজ এবং এটি তেলের মধ্যে স্থিতিশীল থাকে, যা ভিটামিন 'এ' এর শোষণকে কার্যকর করে। মানসম্মত উপায়ে ভিটামিন 'এ' মিশ্রণ করলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ তেলের স্বাদ, গন্ধ, রঙ কোনটিরই পরিবর্তন হয় না। বিশ্বের ৭৫টি দেশে বর্তমানে ভোজ্যতেলের সাথে ভিটামিন 'এ' মিশ্রণ করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে নভেম্বর ২০১৩-এ ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন ২০১৩ পাশ হয়েছে। এ আইনের আওতায় ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' দ্বারা সমৃদ্ধকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৪.২.৪ সমৃদ্ধকৃত ভোজ্যতেলের গুণগত মান বজায় রাখা

ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ভোজ্যতেলকে বাতাস ও সূর্যের আলো থেকে দূরে মুখবন্ধ পাত্রে রাখতে হয়। প্যাকেটের গায়ে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধির বিবরণ এবং সরকার অনুমোদিত লোগো দেখে এটি চেনা যায়। বাংলাদেশে প্রতি লিটার ভোজ্যতেলে ১৫ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'এ' মিশ্রিত করার মান নির্ধারিত আছে।

৪.২.৫ শিশুদের ভিটামিন 'এ' সাপ্লিমেন্টেশন এবং খাবারে সমৃদ্ধকৃত ভোজ্যতেল ব্যবহার

বয়সভেদে সকল বয়সের শিশুর প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ ভিটামিন 'এ' এর চাহিদা রয়েছে, যা প্রতিদিনের গ্রহণকৃত খাদ্য থেকে পূরণ হওয়ার কথা। কিন্তু শিশুর প্রতিদিন যে পরিমাণ প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ খাবার খায় তা থেকে তাদের শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী ভিটামিন 'এ' এর চাহিদা পূরণ হয় না। প্রতিদিনের এই চাহিদা পূরণের জন্য শিশুকে নিয়মিত ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ তেল খাওয়ানো প্রয়োজন। এই ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ তেল শিশুর প্রতিদিনের চাহিদার একটি সামান্য অংশ পূরণ করে থাকে। তাই শিশুদের ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ভোজ্যতেল ও ভিটামিন 'এ' সাপ্লিমেন্ট পাশাপাশি খাওয়ানো প্রয়োজন। ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ভোজ্যতেল যা ৬ মাস থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুসহ সকল জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ এবং এর কোনো উল্লেখযোগ্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই, এমনকি ডায়াবেটিক, হার্ট বা কিডনি রোগী অথবা গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রেও গ্রহণযোগ্য।

৪.২.৬ ভোজ্যতেলে বাধ্যতামূলকভাবে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন

"ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১৩" এর আওতায় ভোজ্যতেল ভিটামিন 'এ' দ্বারা বাধ্যতামূলকভাবে সমৃদ্ধকরণ, ভোজ্যতেলের আমদানী নিয়ন্ত্রণ ভিটামিন 'এ' দ্বারা সমৃদ্ধ ভোজ্যতেলের বোতল, প্যাকেট, টিন কিংবা অন্যান্য পাত্রের গায়ে প্রতীক (Fortification logo) সম্বলিত মোড়ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়ছে। ভোজ্যতেলের খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা ও হোটেল,

রেস্তোরাঁসহ বাণিজ্যিকভাবে খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের দ্বায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। ভোজ্যতেলের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ ও তদারকির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আইনটিতে শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম এবং সমীক্ষা ও বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নের বিষয়ও অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। এছাড়াও এ আইনে বিভিন্ন পর্যায়ে অপরাধ ও দণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪.৩ ভিটামিন 'ডি' দিয়ে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ

ভিটামিন 'ডি' আমাদের শরীরে খাবার থেকে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শোষণ করে, হাড় ও দাঁত গঠন ও শক্তিশালী করণে এবং পেশী ও মস্তিষ্কের কোষগুলো সচল রাখতে সহায়তা করে। এটি আমাদের দেহে প্রদাহ হ্রাস করা, কোষের বৃদ্ধি, স্নায়ু, পেশী ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার কার্যকরিতা এবং গ্লুকোজ বিপাকের মতো প্রক্রিয়াগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। গবেষকদের মতে ভিটামিন 'ডি' কোলন, স্তন, প্রোষ্টেট এবং ডিম্বাশয়ের ক্যান্সারের ঝুঁকি হ্রাসে উপকারী প্রভাব ফেলে। এর অভাবে হাড়ের ব্যথা, পেশী ব্যথা এবং পেশী দুর্বলতার ঝুঁকি বেড়ে যায়। ভিটামিন 'ডি' এর অভাবে শিশুদের **রিকেট** এবং প্রাপ্তবয়স্কদের **অস্টিওম্যালেসিয়া** (হাড় নরম হয়ে যাওয়া) হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। বিশ্বব্যাপী ভিটামিন 'ডি' এর অভাব একটি বড় জনস্বাস্থ্য উদ্বেগ। বাংলাদেশেও প্রি-স্কুল শিশুদের মধ্যে ৩৯.৬% এবং স্কুল-বয়সী শিশুদের মধ্যে ৪৫.৫% ভিটামিন 'ডি' ঘাটতি দেখা যায়, যা বস্তির শিশুদের মধ্যে সর্বোচ্চ।

৪.৩.১ ভিটামিন 'ডি' এর অভাবের কারণসমূহ

ভিটামিন 'ডি' এর ঘাটতির প্রধান কারণগুলো হলো:

- **অপর্যাপ্ত গ্রহণ:** ভিটামিন 'ডি' সমৃদ্ধ খাবার কম খাওয়া এবং উচ্চ ফাইলেটের মাত্রা।
- **সূর্যালোকের অভাব:** আধুনিক জীবনযাত্রা এবং নগরায়নের কারণে সূর্যের আলোর সীমিত সান্নিধ্য (ত্বক পর্যাপ্ত সূর্যালোক না পাওয়া)।
- **মাতৃকালীন ঘাটতি:** মায়েদের মধ্যে প্রসবপূর্ব ভিটামিন 'ডি' এর অভাব শিশুর ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।
- **বৃদ্ধবয়স:** বয়স্ক লোকের ত্বকে ভিটামিন 'ডি' সংশ্লেষণ হ্রাস পায়।
- **গায়ের রঙ:** গাঢ় ত্বকে (Dark skin) ভিটামিন 'ডি' সংশ্লেষণ কম হয়।
- **কিডনি এবং লিভারের সমস্যা (Kidney and Livere disease):** এনজাইম উৎপাদন ব্যহত হয় এবং ভিটামিন 'ডি' তৈরী কমে যায়।
- **স্থুলতা এবং পাকস্থলী বাইপাস সার্জারি (Obesity and Bypass Surgery):** আতিরিক্ত স্থূল বা ওজনাধিক্য হলে ও বাইপাস সার্জারি করা হলে ভিটামিন 'ডি' সংশ্লেষণ কমে যায়।
- **তথ্যের অভাব:** ভিটামিন 'ডি' সম্পর্কিত পর্যাপ্ত গবেষণা ও জাতীয় কৌশলের অভাব।

৪.৩.২ ভিটামিন 'ডি' সমৃদ্ধকরণ: বাংলাদেশের প্রচেষ্টা

ভিটামিন 'ডি' এর ঘাটতি মোকাবেলায় ভোজ্যতেল ও চালে ভিটামিন 'ডি' সমৃদ্ধকরনের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও বিভিন্ন সংস্থা কাজ করছে। **বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য আইন ২০২৩** অনুযায়ী, গুঁড়ো দুধ সমৃদ্ধকরণের সময় ভিটামিন 'এ' এবং 'ডি' যোগ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যা শুধুমাত্র সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত কর্মসূচিতে (Social Safety Net Program) ব্যবহৃত হবে।

৪.৪ চাল সমৃদ্ধকরণ

চাল (ভাত) বাংলাদেশী জনগণের প্রধান খাদ্য এবং দৈনিক মাথাপিছু ৩৬৭ গ্রাম চাল (BBS HEIS, 2022) খায় বলে চাল পুষ্টিকরণ (Rice fortification) পুষ্টি ঘাটতি মোকাবেলায় একটি কার্যকর কৌশল। যথাযথ পুষ্টির জন্য মাথাপিছু খাবারেচালের পরিমান আরো কমানো উচিত। চাল বাবদ খরচ এখনোও বেশিরভাগ মানুষের খাদ্য বাজেটের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। চালে অনুপুষ্টি উপাদানের অভাব রয়েছে। বিশেষ করে অতিরিক্ত ছাটাইয়ের জন্য চালের উপরিভাগে বিদ্যমান ভিটামিন ও খনিজি পদার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয় যা পূরন করা আবশ্যক। আমাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় অনুপুষ্টি উপাদানগুলো চালে সমৃদ্ধ করা হলে জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে শিশু, গর্ভবতী ও স্তন্যদাকারী নারী বিভিন্ন রোগবালাই থেকে সুরক্ষিত থাকবে এবং সুস্থাস্থ্যের অধিকারী হবে।

৪.৪.১ চাল সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম

খাদ্য মন্ত্রাণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় যৌথভাবে জাতিসংঘের বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর নিরিড় সহযোগিতায় ২০১৩ সালে পাইলট কার্যক্রমের মাধ্যমে চাল সমৃদ্ধকরণ শুরু করে। জনসংখ্যার অনুপুষ্টির অভাব দূরিকরণের জন্য ২০১৬ সালে নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশানাল (NI) চাল সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচীতে বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত হয়। বর্তমানে দেশে ১২টি কারখানায় ফর্টিফাইড রাইস কার্নেল (FRK) উৎপাদন হচ্ছে এবং ১৭৮টি কারখানায় সাধারণ চালের সাথে FRK ১০০:১ অনুপাতে মিশ্রিত হচ্ছে; WFP এবং NI যৌথভাবে উৎপাদন ও মান সংরক্ষণে কারিগরী ও কেশৌলগত সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

২০২৪ সাল পর্যন্ত দুস্থ নারী সুবিধাভোগী (VWB)-এর আওতায় ২০৫টি উপজেলায় এবং খাদ্য বান্ধব কর্মসূচী (FFP) -এর আওতায় ২৭৬টি উপজেলায় সমৃদ্ধকৃত চাল প্রদান করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বিশ্বখাদ্য কর্মসূচী সরকারের সাথে যৌথভাবে ২০১৩ সালে যখন চাল সমৃদ্ধকরণ চালু হয় তখন মাত্র ৩০,০০০ লোকের মাঝে পুষ্টি চাল বিতরন করা সম্ভব হয়েছিল এবং বর্তমানে ১৫ মিলিয়ন অতি দরিদ্র (Ultra poor) জনগোষ্টি এ সুবিধা ভোগ করছে।

৪.৪.২ পুষ্টি সমৃদ্ধ চালের গ্রহণযোগ্যতা ও পুষ্টি উপাদান

বাংলাদেশে পুষ্টিসমৃদ্ধ চালের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ইতিবাচক গবেষণা ফলাফল পাওয়া গেছে এবং এর কার্যকারিতা নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী গবেষণা চলছে। এখন পর্যন্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ চাল সরকারিভাবেই বিতরণ করা হচ্ছে। তবে সাধারণ জনগোষ্ঠী এ চাল বাজার থেকে ক্রয় করতে ইচ্ছুক। সরকারি মান (Standard) অনুযায়ী পুষ্টিসমৃদ্ধ চালে নিম্নেলিখিত উপাদানগুলি (পিপিএম-পার্টস পার মিলিয়ন অথবা মিলিগ্রাম/কেজি) থাকা বাধ্যতামূলক।

ক্রমিক নং	অণুপুষ্টি উপাদান	পুষ্টি সমৃদ্ধ চাল মিলি গ্রাম/কেজি	এফ. আর. কে মিলি গ্রাম/কেজি	নিরাপদ সংরক্ষণ কাল
০১.	আয়রন	৬.০	৫০০০-৭০০০	৩০° সে তাপমাত্র এবং ৬৫% R.H-এ ১২ মাস
০২.	জিংক	৪.০	৩৫০০-৪৫০০	
০৩.	ভিটামিন বি$_১$	৪.০	৪৫০-৬০০	
০৪.	ফলিক অ্যাসিড	১.৩	১৫০-১৯০	
০৫.	ভিটামিন বি$_{১২}$	০.০১	১.১৫-১.৪৫	
০৬.	ভিটামিন এ	১.৫০	১৮৫-২১৫	

(Source: BDS 1897:2022)

৪.৪.৩ পুষ্টি চালের রন্ধন ও সংরক্ষণ পদ্ধতি

সাধারণ চালের মতোই পুষ্টি চাল রান্না করা যায়, তবে কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত:

- **ধোয়া:** চাল রান্নার আগে দীর্ঘ সময় ধরে পানিতে ভিজিয়ে রাখা বা অতিরিক্ত কচলিয়ে ধোয়ার প্রয়োজন নেই। হালকাভাবে ২-৩ বার ধুয়ে নিলেই যথেষ্ট, কারণ অতিরিক্ত ধোয়ার ফলে চালের উপরের স্তরে থাকা পুষ্টি উপাদান ধুয়ে যেতে পারে।
- **রান্না:** ভাত রান্নার সময় এমনভাবে পানি দিতে হবে যেন সেদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে পানি শুকিয়ে যায় এবং ভাতের মাড় ফেলার প্রয়োজন না হয়। মাড় ফেলে দিলে পুষ্টি উপাদান কমে যায়।
- **সংরক্ষণ:** পুষ্টি চালে মিশ্রিত ভিটামিন ও খনিজ লবণ তাপ, পানি ও জলীয় বাষ্পের প্রতি সংবেদনশীল। তাই সঠিক উপায়ে বাতাস ও সূর্যের আলো থেকে দূরে শুষ্ক স্থানে সংরক্ষণ করা উচিত।

চাল সমৃদ্ধকরণ বাংলাদেশের পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদার করতে এবং অণুপুষ্টির ঘাটতি মোকাবেলায় একটি কার্যকর ও টেকসই সমাধান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

৪.৫ গমের আটা সমৃদ্ধকরণ

বাংলাদেশে গমের আটা ও ময়দা সমৃদ্ধকরণ একটি ঐচ্ছিক কার্যক্রম। বিএসটিআই প্রণীত মানদণ্ড অনুসরণ করে সীমিত পরিসরে গমের আটায় অনুপুষ্টি সমৃদ্ধকরণ করা হচ্ছে, যার প্রধান লক্ষ্য আয়রন, ফলিক অ্যাসিড, জিঙ্ক, ভিটামিন এ ও বি১২-এর মতো অনুপুষ্টি উপাদানের ঘাটতি পূরণ করা। এটি জনস্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানে একটি কৌশলগত পদক্ষেপ।

৪.৫.১ গমের আটা সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রমের সূচনা ও বিস্তার

বাংলাদেশে গমের আটা সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রমের সূচনা হয় ১৯৯৯ সালে, যখন এটি প্রথম জাতীয় আলোচনায় আসে। ২০০২ সালে পুষ্টি ঘাটতি প্রতিরোধে এটি একটি কার্যকর হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে, **গেইন (GAIN), ইউএসএআইডি (USAID) এবং বাংলাদেশ সরকারের** খাদ্য ও স্বাস্থ্য বিভাগ যৌথভাবে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। ২০০৩-২০০৫ সালের মধ্যে ২৫টি বড় চক্রাকার মিলে একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়, যেখানে সমৃদ্ধকরণ প্রযুক্তি, পরিমাপ উপকরণ ও কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই সফলতার ভিত্তিতে ২০১৩ সালে বাংলাদেশ সরকার বড় মিলগুলোর জন্য গমের আটা ও ময়দা সমৃদ্ধ করার বাধ্যবাধকতা জারি করে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (WFP) এই কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে এবং বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে ভিজিডি (VGD) কর্মসূচির আওতায় দুস্থ পরিবারগুলোতে (প্রায় ৩০,০০০ সুবিধাভোগী) সমৃদ্ধ পুষ্টি আটা সরবরাহ করা হয়। প্রতিটি পরিবারকে ২৫ কেজি পুষ্টি আটা দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (বিএফএসএ) ২০২৩ সালে খসড়া ‘ঐচ্ছিক ও বাধ্যতামুলক খাদ্য সমৃদ্ধিকরণ নীতিমালা’ প্রকাশ করে, যেখানে আটা সমৃদ্ধকরণের বিষয়টা সম্পৃক্ত রয়েছে। পরবর্তিতে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে গেইন ও ইফাদ্ মাল্টি প্রোডাক্টস লিমিটেড যৌথভাবে বানিজ্যিক পর্যায়ে আটা সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচী উদ্বোধন করে।

৪.৫.২ পুষ্টি উপাদান এবং নীতিমালা বাস্তবায়ন

গমের আটায় সাধারণত যে অনুপুষ্টি উপাদানগুলো যোগ করা হয়, তার মধ্যে রয়েছে: ভিটামিন এ, আয়রন, ফোলেট (ফলিক অ্যাসিড), ভিটামিন বি১, বি২, বি৬, বি১২ এবং জিংক। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (BSTI) কর্তৃক নির্ধারিত মাত্রা নিম্নে প্রদান হলো-

ক্রকিম নং	অণুপুষ্টি উপাদান	পুষ্টি সমৃদ্ধ আটা ও ময়দায় পরিমান মি. গ্রাম/কেজি
১)	ক্যালসিয়াম	৫৩
২)	আয়রন	৫৫
৩)	ভিটামিন বি$_{১}$	৬.০
৪)	ভিটামিন বি$_{২}$	৪.০
৫)	ভিটামিন বি$_{৬}$	১৫
৬)	ভিটামিন বি$_{৯}$	৫.০
৭)	ভিটামিন বি$_{১২}$	০.০১
৮)	ভিটামিন এ	৩.০
৯)	ফলিক এসিড	২.০
১০)	জিঙ্ক	২৭

এই নীতিমালা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বিএসটিআই এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা (যেমনঃ গেইন, ইউনিসেফ, ডব্লিউএফপি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মিল পর্যায়ে পরিদর্শন, গুণগত মান পরীক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধি এই কাঠামোর অংশ।

৪.৫.৩ গমের আটা সমৃদ্ধকরণের উপকারিতা

গমের আটা সমৃদ্ধকরণ বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ, কার্যকর এবং টেকসই হস্তক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত, যার প্রধান উপকারিতাগুলো নিম্নরূপ :

- রক্তস্বল্পতার মাত্রা **হ্রাস:** আয়রন ও ফলিক এসিড সমৃদ্ধ আটা নিয়মিত গ্রহণের ফলে হিমোগ্লোবিন মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং রক্তস্বল্পতার মাত্রা কমে।
- **গর্ভকালীন জটিলতা প্রতিরোধ:** ফলিক অ্যাসিডের অভাবজনিত নিউরাল টিউব ডিফেক্ট (NTD) প্রতিরোধে সহায়তা করে।
- **শিশুর বৃদ্ধি ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি:** অনুপুষ্টি উপাদান শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা এবং স্নায়বিক বিকাশে সহায়ক।
- **খাদ্য নিরাপত্তায় ইতিবাচক প্রভাব:** গমের আটা নিয়মিত খাদ্য উপাদান হওয়ায় সহজেই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করা সম্ভব হয়, যা অন্যান্য পুষ্টি হস্তক্ষেপের তুলনায় অধিকতর কার্যকর ও সাশ্রয়ী।
- **উৎপাদনশীলতা ও অর্থনৈতিক সুবিধা:** পুষ্টি উন্নয়নের ফলে শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর কর্মক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে। প্রতি ১ ডলার বিনিয়োগে ৯.৩০ গুণ পর্যন্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা পাওয়া সম্ভব।

৪.৫.৪ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

গমের আটার সোশ্যাল সেফটি নেট শক্তিশালীকরণে, খোলা বাজার বিক্রয় (ওএমএস) এবং ভিজিডি কর্মসূচির মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করা হচ্ছে। যদিও এই কর্মসূচিগুলি মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩%-এর কাছে পৌঁছায়, শিল্পভিত্তিক মিশ্রিত আটার বাধ্যতামূলককরণ একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পুষ্টি পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে। ফুড ফর্টিফিকেশন ইনিশিয়েটিভ (FFI) এবং নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনাল (Nutrition International) এর গবেষণা অনুযায়ী, দেশের সব শিল্প পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাত গমের আটা ও চাল বাধ্যতামূলকভাবে সমৃদ্ধ করা হলে তা প্রায় **১২১** মিলিয়ন মানুষ, অর্থাৎ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭৫%-এর কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হবে।

এ কর্মসূচী সফল করতে হলে খাদ্য মন্ত্রনালয়কে মুক্ত বাজারে পুষ্টি সমৃদ্ধ আটা সরবরাহের জন্য কারিগরী ও আর্থিক সহযোগিতা জোরদার করতে হবে। তাছাড়া পুষ্টি সমৃদ্ধ আটার অনুপুষ্টিমান পরীক্ষা করার জন্য জাতীয় গবেষণাগারকে আরোও আধুনিক এবং যুগোপযোগী করতে হবে।

তথ্যসূত্র: Becky L Tsamg. Asia Pacific Technical Officer, Food Fortification Initiative 2020. Feasibility of Whiteflower Fortification in Bangladesh.